وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

● ৯ম বর্ষ ● ১১তম সংখ্যা ● সেপ্টেম্বর ২০২৫

Web : www.al-itisam.com

মানবাধিকার
জাতিসংঘ বনাম ইসলাম

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٩، ربيع الأول و ربيع الثاني ١٤٤٧هـ/ سبتمبر ٢٠٢٥م العدد: ١١، الجزء: ١٠٧
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য) — হিজরী ১৪৪৭ || ঈসায়ী ২০২৫ || বঙ্গীয় ১৪৩২

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১- সেপ্টেম্বর	০৮ - রবী: আউ:	সোমবার	৪.২৩	৫.৪০	১১.৫৮	৩.২৬	৬.১৭	৭.৩৪
০৫- সেপ্টেম্বর	১২ - রবী: আউ:	শুক্রবার	৪.২৫	৫.৪১	১১.৫৭	৩.২৫	৬.১৩	৭.২৯
১০- সেপ্টেম্বর	১৭ - রবী: আউ:	বুধবার	৪.২৭	৫.৪৩	১১.৫৫	৩.২৩	৬.০৮	৭.২৩
১৫- সেপ্টেম্বর	২২ - রবী: আউ:	সোমবার	৪.২৯	৫.৪৪	১১.৫৩	৩.২০	৬.০৩	৭.১৮
২০- সেপ্টেম্বর	২৭ - রবী: আউ:	শনিবার	৪.৩১	৫.৪৬	১১.৫২	৩.১৮	৫.৫৭	৭.১২
২৫- সেপ্টেম্বর	০২ - রবী: আখের	বৃহস্পতিবার	৮.৩৩	৫.৪৮	১১.৫০	৩.১৫	৫.৫২	৭.০৭
৩০- সেপ্টেম্বর	০৭ - রবী: আখের	মঙ্গলবার	৪.৩৫	৫.৪৯	১১.৪৮	৩.১২	৫.৪৭	৭.০২

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	-১
নরসিংদী	-১	-২	-১
কিশোরগঞ্জ	-২	-২	-১
টাঙ্গাইল	+১	+১	+২
ফরিদপুর	+৩	+২	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	-১
গোপালগঞ্জ	+৪	+৩	+১
মাদারীপুর	+২	+১	০
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+১
শরিয়তপুর	+১	০	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-১	-১	+১
শেরপুর	০	০	+৩
জামালপুর	০	+১	+৩
নেত্রকোনা	-৩	-২	-১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৪	-৫	-৭
খাগড়াছড়ি	-৫	-৭	-৬
রাঙ্গামাটি	-৫	-৭	-৭
বান্দরবান	-৫	-৭	-৮
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩
নোয়াখালী	-১	-৩	-৩
লক্ষীপুর	-১	-১	-১
চাঁদপুর	০	-১	-২
ফেনী	-৩	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৭	-৭	-৫
সুনামগঞ্জ	-৬	-৫	-৩
মৌলভীবাজার	-৬	-৭	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৭	+৮
নাটোর	+৫	+৫	+৬
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৩
বগুড়া	+৩	+৩	+৫
নওগাঁ	+৫	+৫	+৭
জয়পুরহাট	+৪	+৪	+৭

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+২	+২	+৭
দিনাজপুর	+৪	+৫	+৯
গাইবান্ধা	+১	+২	+৫
কুড়িগ্রাম	০	+১	+৫
লালমনিরহাট	+১	+১	+৬
নীলফামারী	+৩	+৪	+৮
পঞ্চগড়	+৪	+৪	+১০
ঠাকুরগাঁও	+৫	+৫	+১০

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৫	+৪	+২
বাগেরহাট	+৪	+৩	+২
সাতক্ষীরা	+৭	+৬	+৫
যশোর	+৬	+৫	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৭
মাগুরা	+৪	+৪	+৩
নড়াইল	+৫	+৪	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+২	+১	-১
পটুয়াখালী	+২	+১	-১
পিরোজপুর	+৩	+৩	০
ঝালকাঠি	+২	+২	০
ভোলা	+১	০	-২
বরগুনা	+৩	+২	০

■ সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

৯ম বর্ষ
১১তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩২
রবীউল আউয়াল-রবীউল আখের ১৪৪৭

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
◆ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
◆ মো: নাসির উদ্দিন ◆ আল আমিন
◆ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সার্কুলেশন ম্যানেজার মো: নাইমুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমাদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
» হৃদয়ের ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মর্যাদা ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান (পর্ব-৬) ০৭
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ (মিন্নাতুল বারী-৭ম পর্ব) ১২
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» ঈদে মীলাদুন নবী: পরিচয়, উৎপত্তি, শারঈ হুকুম ও করণীয় ১৫
-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ

» কালো যাদু ও বদনযর নিয়ে কিছু কথা ১৮
-সাঈদুর রহমান

» আদ-দাওয়া ইলাল্লাহ: এসো! আল্লাহর পথে... (পর্ব-৩) ২২
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» উকিল বাবা কালচার ২৫
-মুহাম্মাদ সিরাজ উদ্দীন

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» প্রকৃত ঈমানদারদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা ও কর্তৃত্ব ২৬
-অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ উসওয়াতুন হাসানাহ
» রাগ প্রশমনের নববী পদ্ধতি ২৯
-হাসান আল-বান্না মাদানী

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ
» উত্তরায় বিমান বিধ্বস্ত: ইতিহাসে ভয়াবহতার নতুন সংযোজন ৩১
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

◈ দিশারী
» হতাশা থেকে মুক্তির মেডিসিন ৩৫
-রাকিব আলী

◈ জামি'আহ পাতা
» আক্বল ও নাফস: অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব ও সত্য পথে চলার সংগ্রাম ৩৮
-আদিল বিন ফোরকান

◈ কবিতা ৪০

◈ সংবাদ ৪১

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০

সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮ | ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

মানবাধিকার: জাতিসংঘ বনাম ইসলাম

মানবাধিকার বলতে মানুষের অধিকারকে বোঝানো হয়। মানুষ যেহেতু বুদ্ধিমান প্রাণী সেহেতু সে জন্মগতভাবেই অসংখ্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে জন্ম নিয়ে থাকে। সমগ্র পৃথিবীর সকল কিছুকে আল্লাহ তাআলা মানুষের সেবার জন্য অধীন করেছেন। মানুষকে ফেরেশতাদের দিয়ে সিজদা করিয়ে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন। মানুষের অধিকার ও সম্মান দিতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে এবং মানুষের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পণ্যে পরিণত করা হারাম করেছেন। শুধু তাই নয়, চলমান বিশ্বব্যবস্থা প্রদত্ত পাঁচটি মৌলিক অধিকার ছাড়াও একমাত্র ইসলাম মানুষের সম্মানকে অন্যতম মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেউ কোনো মানুষের গীবত-অপবাদ দিতে পারবে না। কোনো মানুষের বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে পারবে না। মানুষকে অপছন্দনীয় নামে ডাকতে পারবে না। ইসলামের সর্বোচ্চ নিদর্শন আল্লাহর ঘর পবিত্র কা'বা ধ্বংস করার সাথে মানুষের জান, মাল ও সম্মানহানি করার গুনাহের তুলনা করা হয়েছে।

ইসলামের প্রতিটি হালাল-হারাম ও ফরয-সুন্নাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে মানুষের জীবনের হেফাযত। সকল হালাল হারাম হয়ে যেতে পারে এবং সকল হারাম হালাল হয়ে যেতে পারে শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য। আল্লাহ তাআলা যেহেতু ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী সত্তা, এইজন্য তাঁর কাছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নাই। সকলই এক পিতা এক মাতা আদম ও হাওয়ার সন্তান। সবাই তাঁর বান্দা। কালো, সাদা, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সকল মানবাধিকার তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত। তিনি মহাজ্ঞানী, অত্যন্ত ধৈর্যশীল, অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তাঁর জ্ঞানের কারণে তাঁর বিধান উপযুক্ত। তাঁর ধৈর্যের কারণে দ্রুত শাস্তি নাই। সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করা সাপেক্ষে যৌক্তিক শাস্তি। তাঁর শাস্তি কখনোই শুধু শাস্তি নয়; তাঁর শাস্তি মূলত ন্যায়। তথা অন্য মানুষকে ন্যায়বিচার দেওয়ার স্বার্থে শাস্তির বিধান দিতে হয়েছে। শাস্তির লক্ষ্য পৃথিবীতে শান্তি ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা করা। অন্য মানুষের জান ও মালের হেফাযত করা। তাঁর আইনে কোনো বৈষম্য নাই। রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমারা সকলেই সমান। তাঁর প্রতিটি আদেশ তাঁর দয়া ও তাঁর কল্যাণকামিতা। আর তাঁর প্রতিটি নিষেধ মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো। এক কথায় আমরা বলতে পারি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাধিকার ও সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ মানবাধিকার ইসলাম দিয়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকে সেই ইসলাম ও মুসলিমদেরকে জাতিসংঘ মানবাধিকার শিখাচ্ছে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ইউনিভার্সাল ডিকলারেশন অব হিউম্যান রাইটস (ইউডিএইচআর) ঘোষণা করে। যেই ঘোষণার অসংখ্য বিষয় মুসলিম বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। যেমন উক্ত ঘোষণায় পরিবার বা সমাজের বন্ধনকে গুরুত্ব না দিয়েই ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। যেমন 'জেন্ডার ইকুয়ালিটি'র নামে বিকৃত যৌনাচারকে প্রমোট করা হয়েছে। ছেলে-মেয়ে জেন্ডার বা লিঙ্গ চেঞ্জ করতে পারবে। এটাই নাকি তার জেন্ডারের স্বাধীনতা। ছেলে হয়ে মেয়ের মতো সাজবে আর মেয়ে হয়ে ছেলের মতো সাজবে। এক কথায় ক্বওমে লূতের মতো নিম্ন শ্রেণির সকল বিকৃত মানসিকতার বৈধতা।

আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে ছেলে-মেয়ের সম্পদ বণ্টন হবে সমানভাবে। যা কখনোই পারিবারিক, সামাজিক দায়িত্বের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে না। বরং সমান বণ্টনে ইসলামী সমাজব্যবস্থায় পুরুষ বৈষম্যের শিকার হবে। মহান আল্লাহর নিকটে বিধান প্রণয়নে কখনোই ছেলে বা মেয়ের অতিরিক্ত সুবিধা ধর্তব্য নয়। তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি ভারসাম্য ও ন্যায়কে সামনে রেখে বিধান প্রণয়ন করে থাকেন। লিঙ্গ আলাদা হওয়ার পরও পিতা ও মাতা ছেলের সম্পত্তিতে সন্তান থাকলে সমানভাগে সম্পদ পেয়ে থাকেন। লিঙ্গ আলাদা হওয়ার পরও পিতার সম্পত্তিতে কন্যা তার চাচার চেয়ে বেশি অংশ পেয়ে থাকেন। সুতরাং আল্লাহর বিধানে লিঙ্গ ধর্তব্য নয়। মহান আল্লাহর সম্পত্তি বণ্টনে কয়েকটি বিষয়কে সামনে রাখা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি থেকে কে কত নিকটে, স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর ক্ষেত্রে কার আগে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কে পরিবারে কেমন দায়িত্ব পালন করে থাকে—এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে সবার প্রতি ন্যায় রক্ষা করে পরিবার ও সমাজের ভারসাম্য রেখে সম্পত্তি বণ্টনের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

অতএব উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট, জাতিসংঘের মানবাধিকার বহু দিক থেকে আমাদের ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য হুমকি। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর স্ত্রীগণের নামে কটূক্তি করার অধিকারের নাম হচ্ছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বা বাকস্বাধীনতা। কাদিয়ানীদের স্বীকৃতি হচ্ছে জাতিসংঘের মানবাধিকার। পাহাড়ি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের জন্য আলাদা দেশের বৈধতা তৈরি করা হচ্ছে জাতিসংঘের মানবাধিকার। এই কারণেই এখন পর্যন্ত সঊদী আরব এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেনি। সঊদী আরবসহ মুসলিম দেশগুলো জাতিসংঘের বিকল্প হিসেবে OIC-এর মাধ্যমে ১৯৯০ সালে মিশরের রাজধানী কায়রোতে 'Islamic Human Rights' ঘোষণা করে। যার মূল প্রতিপাদ্য ছিলে- All human rights are subject to Islamic Shariah.

সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ ৫৬ নং পৃষ্ঠায়

হৃদয়ের ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় এবং উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মর্যাদা

-মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَنَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَمِعْنَاهُ. فَقَالَ لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ قَالُوا أَجَلْ. قَالَ تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ فَقُلْتُ أَنَا. قَالَ أَنْتَ لِلَّهِ أَبُوكَ. قَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ». قَالَ حُذَيْفَةُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ. قَالَ عُمَرُ أَكْسْرًا لاَ أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ. قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ. حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ.

সরল অনুবাদ: হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণনা করেন, ‘আমরা একবার উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নিকট বসে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ফেতনা সম্পর্কে আলোচনা শুনেছে? কিছু ছাহাবী বললেন, আমরা শুনেছি। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, তোমরা হয়তো বুঝেছ সেই ফেতনার কথা, যা মানুষের পরিবার ও প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘটে থাকে? তারা বললেন, ‘জি, হ্যাঁ, (ঠিক তাই)’। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, ‘এই ধরনের ফেতনা তো ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও ছাদাক্বার মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। কিন্তু আমি জানতে চাই, তোমাদের মধ্যে কে এমন ফেতনার কথা শুনেছে, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আসবে? এ কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে যান। তখন আমি (হুযায়ফা) বললাম, আমি শুনেছি। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, তুমি? তোমার পিতা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হোক! হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ‘ফেতনাগুলো মানুষের অন্তরসমূহের উপর আরোপিত হবে, যেমনভাবে চাটাই শলাকা দিয়ে একটার পর একটা দিয়ে বোনা হয়। যে হৃদয় সেই ফেতনাকে গ্রহণ করবে, তাতে একটি কালো দাগ পড়বে। আর যে হৃদয় ফেতনাকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাতে একটি সাদা দাগ পড়বে। এক পর্যায়ে মানুষের হৃদয় দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যাবে— (১) একটি হৃদয় হবে শুভ্র পাথরের ন্যায় সাদা ও পরিষ্কার; আসমান-যমীন বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোনো ফেতনা সেটার ক্ষতি করতে পারবে না। (২) অপর হৃদয় হবে কালো, ধূসর ও উল্টানো কলসের মতো, সেটা না কোনো ভালোকে চিনতে পারবে, না কোনো মন্দকে মন্দ মনে করবে; শুধু তার প্রবৃত্তি যা পছন্দ করে, তাই সে সঠিক মনে করবে’। (বন্ধ দরজা সম্পর্কে) হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বললাম, ‘আপনার এবং ওই ফেতনার মধ্যে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে, যা শীঘ্রই ভেঙে ফেলা হবে। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, ‘কী বলছো! সেটা কি ভেঙে ফেলা হবে? সেটা খুলে দেওয়া হলে তো আবার বন্ধ করা যেত!’ আমি বললাম, ‘না, বরং সেটা ভেঙে ফেলা হবে। আমি আরও বললাম যে, সে দরজা হলো একজন ব্যক্তি, যাকে হয়তো হত্যা করা হবে অথবা তিনি মারা যাবেন। এটা এমন হাদীছ, যাতে কোনো ভুল নেই’।[১]

ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন কেউ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুসরণ করবে ও তাঁর আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করবে। আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (হে রাসূল!) আমরা আপনাকে তাদের উপর পর্যবেক্ষণকারী রূপে প্রেরণ করিনি’ *(আন-নিসা, ৪/৮০)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের প্রতিটি দিক সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি শুধু আল্লাহর বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন—এমন নয়, বরং জীবনঘনিষ্ঠভাবে দ্বীনকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কোন কাজ মানুষকে ফেতনায় ফেলবে, কোন পথ তাকে ধ্বংস করবে এবং সে পথ বা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার উপায় কী তাও তিনি বলে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যে ধ্বংস হওয়ার সে যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয় আর যে জীবিত থাকার সে যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর বেঁচে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’ *(আল-আনফাল, ৮/৪২)*।

আজ আমরা ফেতনার এমন যুগে প্রবেশ করেছি, যেখানে বহু হৃদয় অন্ধ হয়ে গেছে, মানুষ ভালোকে ভালো বলা বন্ধ করেছে, মন্দকে মন্দ মনে করা থেকে বিরত থেকেছে।

আমাদের কর্তব্য হলো— (ক) আল্লাহর প্রতি ভয় রাখা, (খ) নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা, (গ) অন্তর থেকে ফেতনাকে ঘৃণা করা এবং (ঘ) অন্তত নিজ হৃদয়ে মন্দের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। আল্লাহ আমাদের অন্তরসমূহকে হেদায়াত দান করুন এবং ফেতনা থেকে হেফাযত করুন- আমীন!

উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর ফেতনা সম্পর্কে জানতে চাওয়ার কারণ হলো, তিনি নিজেকে ফেতনা থেকে বাঁচাতে চাইতেন। তিনি স্পষ্ট করে বললেন, আমি পরিবার বা প্রতিবেশীর সাথে ঘটে যাওয়া ছোটখাটো ফেতনা সম্পর্কে জানতে চাই না; বরং আমি সেই ভয়াবহ, সর্বগ্রাসী ও ব্যাপক ফেতনা সম্পর্কে জানতে চাই, যে ফেতনা সমগ্র সমাজকে গ্রাস করে ফেলবে।

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৪।

হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিবার-পরিজনও মানুষের জন্য এক ধরনের পরীক্ষা বা ফেতনা। স্ত্রী-সন্তান, ধনসম্পদ ও আত্মীয়স্বজনের কারণে মানুষ নানা প্রলোভন ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তাদেরকে অতিরিক্ত ভালোবাসে, তাদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত থাকে এবং তাদের কারণে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে, ইবাদতে গাফেল হয় এবং বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি তোমাদের জন্য ফেতনা' *(আত-তাগাবুন, ৬৪/১৫)*। ছহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক করে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সন্তান হলো (মানুষের) কৃপণতা ও কাপুরুষতার জায়গা'।[২]

অতএব, বুদ্ধিমান মুমিন সে-ই, যে তার পরিবারকে ভালোবাসে, কিন্তু তাদের ভালোবাসা তাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত রাখতে পারে না। সে এ ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকে। পরিবারের সাথে সংঘটিত ফেতনার আরেকটি ব্যাখ্যা হলো পিতামাতার সন্তানের হক্ক আদায়ে গাফলতি করা। যেমন— তাদের আদব-কায়দা, দ্বীনী শিক্ষা, আল্লাহর বিধিবিধান, উত্তম চরিত্র শেখানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শন করা। এসবই ফেতনার মধ্যে পড়ে। কারণ পিতামাতা তাদের সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ এবং ক্বিয়ামতের দিন এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।

আর প্রতিবেশীর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা বা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অবহেলা করা এই শ্রেণির ফেতনার পর্যায়ভুক্ত। এ ধরনের ছোট ছোট ফেতনাও জবাবদিহিতার দাবি রাখে। তবে এসব পাপ এমন নয় যে এগুলো ক্ষমার অযোগ্য, বরং নেক আমলের মাধ্যমে এসব পাপ মুছে যায়।[৩] যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দকর্মকে মোচন করে দেয়' *(হূদ, ১১/১১৪)*। এ ধরনের ক্ষুদ্র ফেতনা সম্পর্কে উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, ছালাত, ছিয়াম ও ছাদাক্বা এগুলোকে মুছে দেয়।

উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু এমন ফেতনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, যা উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আবির্ভূত হবে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তখন হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করলেন। হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু ছিলেন সেই মহান ছাহাবী, যিনি ফেতনা সংক্রান্ত বহু হাদীছের জ্ঞান রাখতেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটবর্তী বিশ্বস্ত ছাহাবী, যার কাছে তিনি মুনাফেক্বদের নামসমূহ এবং ফেতনার বহু গোপন তথ্য সংরক্ষণ করেছিলেন।

হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'ফেতনাগুলো মানুষের অন্তরে এমনভাবে আরোপিত হবে, যেমন- মাদুর বোনার সময় একটির পর একটি খেজুরের পাতা প্রবেশ করানো হয়'।[৪] অর্থাৎ আরবের তাঁতিরা মাদুর তৈরি করার সময় যেমন খেজুরের পাতা একটির পর একটি গেঁথে নেন, তেমনি একের পর এক ফেতনা মানুষের হৃদয়ে এসে গেঁথে যাবে। মানুষের হৃদয়ে ফেতনা ধীরে ধীরে এভাবে প্রবেশের অবস্থাকে জীবন্তভাবে প্রকাশ করতে নবী ﷺ এমন দৃষ্টান্তের অবতারণা করেছেন। অতএব, ফেতনা মানুষের হৃদয়ে একটু একটু করে প্রবেশ করতে থাকে। কারণ মহান আল্লাহ তাকে ভালোমন্দের যেকোনো একটি গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তার মধ্যে বিবেক এবং লালসা উভয়ই বিদ্যমান রেখেছেন। তার প্রবৃত্তি যদি তার বিবেকের উপর প্রবল হয়, তবে তার অন্তরে ফেতনা প্রবেশ করে আর যদি তার বিবেক তার কামনাকে পরাভূত করতে পারে, তবে সে ফেতনাকে প্রত্যাখ্যান এবং অস্বীকার করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীতে এসেছে, 'হৃদয়ে ফেতনা পান করিয়ে দেওয়া হয়'-এর অর্থ হলো, ফেতনা হৃদয়ের উপর এমনভাবে কর্তৃত্ব স্থাপন করে যে, পাপের প্রতি ভালোবাসা ও আসক্তি গভীরভাবে গেঁথে যায়; যেন হৃদয় ফেতনার মিষ্টি বিষে সিক্ত ও পরিতৃপ্ত হয়। তখন পাপ ও অন্যায়ের অনুভূতি মনের মধ্যে থাকে না। আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে গো-বৎস পূজার প্রতি তাদের অন্ধ আসক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, 'কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গরুপূজার ভালোবাসা পান করিয়ে দেওয়া হয়েছিল' *(আল-বাক্বারা, ২/৯৩)*।[৫]

অতএব, যার অবস্থা এমন হবে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে। ইবনু দুরাইদ বলেন, 'বস্তুর প্রকৃত রং ব্যতীত অন্য কোনো রং পতিত হলে তাকে নোকতা পতিত হওয়া বলে'।[৬] এটা সেই হৃদয় যার সম্পর্কে ফেতনায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয় এবং এর মালিকের ধ্বংসের আশঙ্কা তৈরি হয়।

অতএব, যখন ফেতনা ক্রমশ মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে থাকে, তখন তা এক অদৃশ্য সংঘর্ষে রূপ নেয়। মানুষের ভেতরে দুটি শক্তি বিরাজ করে— একটি হলো বিবেক-বুদ্ধি, যা তাকে সত্য ও সৎপথের দিকে আহ্বান করে; অপরটি হলো প্রবৃত্তি ও লালসা, যা তাকে পাপ ও অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে। যখন প্রবৃত্তি বিবেকের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখন হৃদয় ফেতনাকে গ্রহণ করে ফেলে এবং তার জন্য পথ খুলে দেয়। আর যখন বিবেক প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়, তখন মানুষ ফেতনাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এই দাগই সেই হৃদয়ের চিহ্ন, যা ফেতনায় নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। এর মালিক তখন সত্যের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং পরিণত হয় অন্ধ ও বিভ্রান্ত আত্মায়।

অন্যদিকে যে হৃদয় ফেতনাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এ হৃদয় ফেতনার আঘাতকে প্রতিহত করে

২. ইবনু মাজাহ, হা/৩৬৬৬; আহমাদ, হা/১৭৫৯৮।
৩. ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, ২/১৭২।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীছে কিতাবে মুসলিম, ১/৩৫৯।
৬. ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, ২/১৭২।

এবং এর প্রলোভনকে অস্বীকার করে। হাদীছে এসেছে, 'যে হৃদয় ফেতনাকে অস্বীকার করে, তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে'। ফলে হৃদয় দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হলো সুস্থ, পবিত্র ও আলোকিত হৃদয়, যা সাদা পাথরের মতো স্বচ্ছ ও দৃঢ়। হাদীছে 'ছাফা' শব্দের অর্থ হলো এমন মসৃণ পাথর, যার সাথে কিছুই আটকে থাকতে পারে না। ঠিক তেমনিভাবে একটি সুস্থ হৃদয় এতটাই স্বচ্ছ যে, কোনো ফেতনাই সেখানে জমতে বা লেগে থাকতে পারে না।[৭] এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আকাশ ও যমীন যতদিন থাকবে, ততদিন কোনো ফেতনা এই হৃদয়ের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না'।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'অন্যটি ধূসর বর্ণের কালো হৃদয়, যা উল্টানো বা কাত হয়ে পড়ে থাকা পাত্রের মতো'। অর্থাৎ মাটির দিকে কাত হওয়া বা উল্টে যাওয়া পাত্র যেমন পানিশূন্য হয়ে যায়।[৮] প্রবৃত্তির প্রতি আকর্ষণ এবং সত্য থেকে বিচ্যুতি অনুযায়ী হৃদয় থেকে ওইভাবে ঈমান বের হয়ে যায়, যেভাবে কাত হওয়া এবং উল্টে যাওয়া পাত্রের অবস্থা অনুযায়ী পানি প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে যায়।

অপরদিকে আরেকটি হৃদয় আছে, যে হৃদয় ফেতনাকে গ্রহণ করে এবং একের পর এক ফেতনাকে পান করে। ধীরে ধীরে সে হৃদয় ফেতনায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং পাপ ও বিভ্রান্তির স্তূপ সেখানে জমতে থাকে। অবশেষে সেই হৃদয় অন্ধকার ও কলুষতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হৃদয়ের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন, 'আরেকটি হৃদয় হয় ধূসর কালো বর্ণের, যেন সেটা উল্টানো বা কাত হয়ে থাকা একটি পাত্র'। অর্থাৎ যেমন কাত হয়ে বা উল্টোভাবে থাকা পাত্র থেকে পানি গড়িয়ে বেরিয়ে যায় এবং তা ফাঁকা হয়ে পড়ে, তেমনি প্রবৃত্তির আকর্ষণ ও গুনাহের আসক্তি হৃদয় থেকে ঈমানকে বের করে দেয়।

আল-মুনযিরী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীছের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'যখন হৃদয় প্রবৃত্তির কাছে বন্দি হয়ে যায় এবং এর ভেতর থেকে আনুগত্য ও নেকীর প্রতি অনুরাগ বিলীন হয়ে যায়, তখন ঈমানের আলো সেখান থেকে সরে যায়। যেমন উপুড় হয়ে থাকা একটি পাত্র থেকে পানি গড়িয়ে বেরিয়ে যায়'।[৯]

আর যে হৃদয় সত্য থেকে বিমুখ হয়ে যায়, এরূপ হৃদয়ের অধিকারীকে তুমি নৈতিকতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত অবস্থায় পাবে। সে আর ভালোকে ভালো মনে করতে পারে না, মন্দকে মন্দ হিসেবে চিনতেও পারে না। তার কলুষিত হৃদয় যার দিকে তাকে টেনে নেয়, সে সেদিকেই যায়। তখন তার বিবেক আর তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন ফেতনার বিরুদ্ধে এক অটল প্রাচীর ও নিরাপত্তার দরজা। একটি বর্ণনায় এসেছে, যখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফেতনার সংবাদ শুনলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! যেন কোনো ফেতনা আমার ওপর আপতিত না হয়। তখন হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, ভয় পাবেন না। আপনার কোনো সমস্যা হবে না।[১০]

হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আশ্বস্ত করার কারণ হলো উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখনও বুঝতে পারেননি যে, তিনি নিজেই সেই শক্ত দরজা, যা ভেঙে গেলে সমাজে ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে। হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, আপনার ও সেই ফেতনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে আর খুব শীঘ্রই সেই দরজা ভেঙে ফেলা হবে। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, খুলে ফেলা হবে নাকি ভেঙ্গে ফেলা হবে?' আমি বললাম, 'না, সেটি ভেঙে ফেলা হবে। আর জেনে রাখুন! সেই দরজাটি হলেন একজন মানুষ, যাকে হয় হত্যা করা হবে, অথবা তিনি মৃত্যুবরণ করবেন।

হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জানিয়ে দিলাম যে, এ কথা আমি কোনো অনুমান বা কল্পনার ভিত্তিতে বলিনি, কোনো লেখকের কল্পিত গল্প থেকেও নয়, গবেষকের ইজতিহাদ থেকেও নয়; বরং এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু হাদীছ, যা সত্য ও প্রমাণিত বাণী।[১১]

এর অর্থ হলো ইসলাম ও ফেতনার মাঝে যে একমাত্র প্রাচীর ও প্রতিবন্ধক ছিল, তা ছিলেন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন ফেতনা উম্মাহর ভেতর প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু যখন তিনি শাহাদাত বরণ করলেন, তখন সেই শক্ত দরজা ভেঙে গেল।[১২]

এই কারণেই হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দরজাটিকে 'খোলা হবে' বলেননি, বরং 'ভেঙে ফেলা হবে' বলেছেন। কারণ কোনো দরজা যদি খোলা হয়, তবে পুনরায় বন্ধ করার সুযোগ থাকে; কিন্তু যে দরজা ভেঙে যায়, সেটা আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না।[১৩]

ছাহাবীদের অনেকেই জানতেন যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন ইসলাম ও ফেতনার মাঝখানের সেই দৃঢ় দরজা। একবার উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাত ধরে টেনে নিলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্বভাব ছিল কঠোর, তাই আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে ফেতনার তালা! আমার হাত ছেড়ে দিন'। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, 'ফেতনার তালা বলতে কী বুঝালে?' তখন আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়েছিলাম। নবী ﷺ বসেছিলেন এবং তাঁর চারপাশে অনেক লোক বসা ছিলেন। আমি গিয়ে সবার পেছনে বসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যতদিন পর্যন্ত এই ব্যক্তি (উমার) তোমাদের মধ্যে থাকবে, ততদিন ফেতনা তোমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না'।[১৪]

৭. আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীছে কিতাবে মুসলিম, ১/৩৫৯।
৮. প্রাগুক্ত, ১/৩৬০।
৯. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/১৮৬।
১০. মূসা শাহিন লাশীন, ফাতহুল মুনঈম শারহে ছহীহ মুসলিম, ১/৪৫৯।
১১. শারহু মুসলিম, ২/১৭৪।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীছে কিতাবে মুসলিম, ১/৩৬১।
১৪. মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আদম ইথুওপী, আল বাহরুল মুহীত্ব আছ ছাজ্জাজ ফী শারহি ছহীহিল ইমাম মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, ৪/১২৮।

আরেক ছাহাবী উছমান ইবনু মাযউন রাযিয়াল্লাহু আনহু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে ফেতনা বন্ধের দেয়াল![১৫] এসব কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কারণ উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে শহীদ করার পরই ফেতনার দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। চারদিকে ফেতনার আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ফেতনা থেকে সাবধান থাকো। কেননা এটি হৃদয়কে কলুষিত করে এবং এর ধ্বংস ডেকে আনে। পর্যায়ক্রমে হৃদয়ে ফেতনা পতিত হতে থাকে। হৃদয় যদি প্রথমটিকে গ্রহণ করে, তবে পরেরটি হৃদয়ে এসে বাসা বাঁধে, এ ধারা অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না হৃদয় কালো অন্ধকারে ছেয়ে যায়।

পাপ ও অবাধ্যতা হলো অন্যতম বড় ফেতনা। আর এই ফেতনা অল্প অল্প করে হৃদয়ে প্রবেশ করতে থাকে। হে মুমিন ভাই! মানুষের হৃদয়ে যখন পাপ প্রবেশ করে, তখন সে অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব করে। তারপর সে অন্য পাপে জড়িয়ে যায় এবং প্রথম পাপের কথা ভুলে যায়। এক সময় সে ধারাবাহিকভাবে পাপে জড়াতে থাকে। পাপ করা এবং ফেতনায় পড়া একে অপরের পথকে মসৃণ করে। তাদের একটি অপরটিকে বাস্তবায়নে আহ্বান জানায়।

হৃদয়ের ভালোমন্দ যাচাই করার মাপকাঠি হলো সে কতটুকু ভালোকে চিনতে পারে এবং মন্দকে অপছন্দ করতে পারে। কিছু মানুষ আছে যারা মন্দ কাজকে খুব কমই পরোয়া করে। চোখের সামনে অন্যায় হতে দেখলেও তাদের হৃদয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না; বরং নিজেরাই সেই মন্দে লিপ্ত হয়, এমনকি অন্যকেও এতে লিপ্ত হতে আহ্বান জানায়। কালো ও পাপাসক্ত হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য হলো সে কোনো মন্দকে মন্দ বলে মনে করে না। অথচ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘পুণ্য হচ্ছে উত্তম চরিত্র আর পাপ হলো যা তোমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে এবং মানুষ জানুক তা তুমি অপছন্দ করো’।[১৬]

বর্তমান সমাজে মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যাদের সামনে অন্যায় সংঘটিত হলেও তাদের হৃদয়ে মন্দ কাজের প্রতি কোনো ঘৃণা সৃষ্টি হয় না; বরং তাদের হৃদয় এসবের নির্যাস পান করে এবং তারা এতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, তাদের হৃদয় মৃত হয়ে যায়। ফলে তারা আর মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না; তবে তারা ব্যতীত, যাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেছেন আর এদের সংখ্যা খুবই অল্প।

যদি ব্যক্তি তার হৃদয়ে কতটুকু ভালো আছে আর কতটুকু মন্দ আছে তা যাচাই করতে চায়, তবে আল্লাহর কোনো বিধানের সীমালঙ্ঘন করলে কিংবা কোনো ফরয কাজ বর্জন করলে তার মনের অবস্থা কেমন হয় তা তার পরখ করে দেখা উচিত এবং একইভাবে যদি সে এমন কোনো মন্দ কাজ দেখে, যা সে প্রতিকার করতে অক্ষম, এমন সময় তার হৃদয় কতটুকু অস্থির হয়, সেটাও তার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কোনো বান্দা যদি হাত দিয়ে মন্দকে পরিবর্তন করতে না পারে এবং জিহ্বা দিয়েও যদি উক্ত কাজের নিন্দা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে কমপক্ষে হৃদয়ের মাধ্যমে সেটাকে তার অপছন্দ ও ঘৃণা করা উচিত। কারণ মন্দ কাজের জন্য দুঃখবোধ করা থেকে একজন মুমিন কোনোভাবেই অব্যাহতি পায় না।[১৭]

নিশ্চয়ই অনেক মন্দ কাজ সংঘটিত হয় আর মুসলিমরা তা দেখে; কিন্তু তারা তা নিষেধ করে না, এমনকি তাদের হৃদয়ে কোনো প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয় না। ফলে দেখা যায়, তারা না দুঃখিত হয়, না চিন্তিত হয়; বরং তারা হাসে, আনন্দ করে, খায়, পান করে এবং স্বাভাবিকভাবে এসব পাপের সাথে মিশে যায়। তবে কোথায় সেই হৃদয়ের প্রতিবাদ, যা না থাকলে একটি সরিষা দানার সমপরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট থাকে না? সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ একবার বলেছিলেন, ‘আমি যখন কোনো মন্দ কাজ দেখি; কিন্তু সে বিষয়ে কথা বলি না, তখন আমি (দুঃখ ও কষ্টের যন্ত্রণায়) রক্তবর্ণ প্রস্রাব করি!’[১৮] তাঁর (সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ) হৃদয়ে মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা এতটাই প্রবল ছিল এবং তাতে তিনি এতটাই মনোযোগী ছিলেন যে, তাঁর খাওয়াদাওয়া, ঘুমানো ও উঠাবসা সর্বাবস্থায় সেই কষ্ট তার সঙ্গী ছিল। এমনকি দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তার তীব্রতায় তিনি রক্তবর্ণ প্রস্রাব করতেন।

হাদীছে যে কালো হৃদয়ের কথা বলা হয়েছে, সেই কালো হৃদয় বলতে এমন হৃদয়কে বুঝানো হয়েছে, যে হৃদয় না ভালোকে গ্রহণ করবে, না মন্দকে অপছন্দ করবে। নিম্নোক্ত হাদীছে এই অর্থকে স্পষ্ট করা হয়েছে, ‘যখন মানুষ ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ বলা বন্ধ করে দেবে, তখন তাদের উপর খারাপ লোকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সময় তাদের সৎ লোকেরা প্রার্থনা করবে, কিন্তু তাদের প্রার্থনা কবুল হবে না’।[১৯] এখানে মন্দকে অপছন্দ করার ধরন নির্দিষ্ট করা হয়নি, যা প্রমাণ করে যে, মন্দকে অন্তত অন্তরে ঘৃণা করা ঈমানের সবচেয়ে নিম্নতম স্তর। আমরা কি এতটুকুও করতে পারি না?

আসুন! হে আমার প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আমরা হৃদয়কে সজাগ রাখি, হৃদয়কে সংশোধন করি, ফেতনা ও পাপের ক্ষেত্রে সতর্ক হই, মন্দ দেখলে অন্তত অন্তরে ঘৃণা করি। কারণ পাপ ও ফেতনার কারণে হৃদয়ের মৃত্যু ঘটে। ফেতনায় জড়িয়ে গেলে আত্মা নষ্ট হয়ে যায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। আমরা যেন ওইভাবে আমাদের রবের আদেশ পালন করতে পারি, যেভাবে তিনি আমাদের আদেশ করেছেন। ফেতনার ঢেউ থেকে বাঁচতে আমরা জ্ঞান, ঈমান ও তাক্বওয়া বাড়াতে সচেষ্ট থাকি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

১৫. ইবনে হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী, ৬/৭০১।
১৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৩; তিরমিযী, হা/২৩৮৯।
১৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯; নাসাঈ, হা/৫০০৮।
১৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২৪৩-২৫৯।
১৯. আহমাদ, হা/২৩৩৭৫; তিরমিযী, হা/২১৬৯, ‘হাসান’।

ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-৬)

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতা:

আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা ভালো কাজ, সততা, পবিত্রতা, উচ্চ লক্ষ্য এবং সুন্দর চরিত্রকে ভালোবাসে। তেমনি তিনি তাদের এমন স্বভাব দিয়েছেন, যাতে তারা মন্দ কাজ, নোংরা আচরণ এবং খারাপ চরিত্র, কাজ ও কথাবার্তাকে ঘৃণা করে। তবুও, মানুষের একটি অংশ এমন রয়েছে, যারা এই স্বাভাবিক সুন্দর স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক কাজ। এটি মারাত্মক নিচু কাজ ও জঘন্য পাপ। এটি চরম বেহায়া ও নির্লজ্জতার বহিঃপ্রকাশ। এটি স্বভাববিরোধী। এ পাপ মহান আল্লাহর অমোঘ নিয়মের পরিপন্থি। এটি চরম সীমালঙ্ঘন ও আল্লাহ প্রদত্ত ফিত্বরাতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন। এর মাধ্যমে আল্লাহর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা হয়। সমকামিতা পশুত্বকেও হার মানায়। মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ﴾ ‘আমি তো জাহান্নামের জন্য অনেক জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে বুঝে না। চোখ আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে দেখে না। কান আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে শোনে না। তারা পশুর মতো, বরং পশুর চেয়েও গোমরাহ। তারাই হলো গাফেল (অসচেতন) লোক’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৭৯)*।

সমকামিতা কী?

সমকামিতাকে আরবীতে ‘লিওয়াত্ব’ (اَللِّوَاطُ) বলা হয়। ‘লিওয়াত্ব’ শব্দটি আরবী ভাষায় ‘লাওতুন’ (لَوْطٌ) শব্দমূল থেকে এসেছে। এই শব্দের মূল অক্ষর লাম (ل), ওয়াও (و) এবং ত্ব (ط) এমন একটি ধারণা বহন করে, যার মর্মার্থ হলো— লেগে থাকা বা আঠার মতো সেঁটে যাওয়া। যেমন আরবীতে বলা হয়, لَاطَ الشَّيْءُ بِقَلْبِي، إِذَا لَصِقَ ‘কোনো কিছু আমার হৃদয়ে লেগে গেছে (অর্থাৎ গভীরভাবে স্থান করে নিয়েছে)।[১] আরও বলা হয়, لاطَ الرَّجُلُ لِواطاً: عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ‘কেউ যদি লূত্ব আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমের মতো কাজ করে, তখন তার ব্যাপারে বলা হয়, সে লিওয়াত্ব করেছে’।[২]

পরিভাষায়— اَللِّوَاطُ هُوَ تَغْيِيْبُ الْحَشَفَةِ فِي دُبُرِ الذَّكَرِ ‘পুরুষের গোপনাঙ্গের অগ্রভাগকে অন্য পুরুষের পায়ুপথে প্রবেশ করানোকে ‘লিওয়াত্ব’ বা সমকামিতা বলা হয়’।[৩]

ইসলামের চোখে সমকামিতা:

সমকামিতা তো দূরের কথা, ইসলাম এর ধারেকাছেও যেতে সতর্ক করেছে। মহান আল্লাহ প্রকাশ্য-গোপন যাবতীয় অশ্লীলতা হারাম করেছেন এবং সেগুলোর নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ ‘বলুন (হে নবী), আমার প্রতিপালক তো শুধু অশ্লীল কাজই হারাম করেছেন, তা প্রকাশ্য হোক বা গোপন’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৩৩)*। তিনি আরও বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ ‘আর তোমরা অশ্লীল কাজের ধারে-কাছে যেয়ো না, তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন’ *(আল-আন‘আম, ৬/১৫১)*।

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ‘একজন পুরুষ যেন আরেকজন পুরুষের গোপন অঙ্গের দিকে না তাকায়, আর এক নারী যেন আরেক নারীর গোপন অঙ্গের দিকে না তাকায়। একজন পুরুষ যেন আরেক পুরুষের সঙ্গে এক কাপড়ে গা ঘেঁষে না শোয়, আর এক নারীও যেন আরেক নারীর সঙ্গে এক কাপড়ে গা ঘেঁষে না শোয়’।[৪] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ‘কোনো নারী যেন অন্য নারীর (শরীর) স্পর্শ না করে, তারপর তার স্বামীর কাছে এমনভাবে বর্ণনা না করে, যেন সে (স্বামী) নিজ চোখে তাকে দেখে ফেলেছে’।[৫]

সমকামিতার ব্যাপারে কুরআন কী বলে?

কোনো কোনো ঘটনা কুরআন মাজীদে একাধিক জায়গায় প্রতিবার আলাদা প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনাশৈলীতে ও নতুন নতুন শব্দচয়নে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। নিশ্চয় মহান আল্লাহ অযথা এভাবে একই ঘটনা বারবার উল্লেখ

---

* বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ইবনু ফারিস, মু‘জামু মাক্বাইসিল লুগাহ (দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খৃ.), ৫/২২১।

২. ইবনু সাইয়্যিদাহ, আল-মুহকামু ওয়াল মুহীতুল আ‘যামু (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২১ হি./২০০০ খৃ.), ৯/২৩৮।

৩. নাফরাবী, আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী আলা রিসালাতি ইবনি আবী যায়েদ আল-ক্বায়রাওয়ানী (দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খৃ.), ১/১১৮।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৮।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৪০।

www.al-itisam.com

করেন না। বরং কুরআনে কারীমে বিভিন্ন ঘটনার এমন পুনরাবৃত্তি মহান প্রজ্ঞা বহন করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: হৃদয়ে উপদেশ ও শিক্ষা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, ঘটনার গুরুত্ব ও তার থেকে পাওয়া শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, একক ঘটনাকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপনের মাধ্যমে কুরআনের কৌশলী বর্ণনাশৈলী তুলে ধরা ইত্যাদি। কুরআন মাজীদের ১৩-এরও বেশি জায়গায় সমকামিতা ও প্রথম সমকামীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিশ্চয় মহান আল্লাহ একই বিষয়ে এতগুলো আয়াত অমূলক বলেননি। বরং এর পেছনে রয়েছে অনেক কারণ। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির পেছনে উপর্যুক্ত হিকমা ও প্রজ্ঞাকে সামনে রেখে এবং সমকামিতার মতো ভয়াবহ বিষয় হওয়ার কারণে আমি সাধ্যানুযায়ী এখানে এ সম্পর্কিত সবগুলো আয়াত পাঠক সমীপে পেশ করেছি। সাথে সাথে আয়াতগুলো থেকে আমরা কী পাই, তাও উল্লেখ করেছি। আয়াতগুলোকে কুরআনের সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

[১] ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)﴾

[১] ‘(৮০) আর আমি লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, “তোমরা কি এমন খারাপ কাজ করে যাচ্ছ, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি? (৮১) তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষের কাছে যাও, বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।” (৮২) উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কার করো, এরা তো এমন লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়। (৮৩) অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিজনদের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছাড়া, সে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৪) আর আমরা তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। কাজেই দেখুন, অপরাধীদের পরিণাম কীরূপ হয়েছিল’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৮০-৮৪)*।

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়: ১. সমকামিতা অত্যন্ত ঘৃণিত অপরাধ, যা লূত আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের পূর্বে জগতের আর কেউ করেনি। ২. এটি মানুষের স্বভাববিরোধী নোংরা কাজ, যা করার কারণে তাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ৩. স্বভাবসিদ্ধ যথার্থ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন সত্ত্বেও তারা লূত আলাইহিস সালাম-এর কথা শোনেনি; বরং তারা তাঁকে এলাকাছাড়া করার হুমকি দিয়েছিল। ৪. কিন্তু মহান আল্লাহ লূত আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী ছাড়া তাঁকে ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে রক্ষা করেছিলেন। ৫. সমকামিতার জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ লূত আলাইহিস সালাম-এর কওমকে পাথরবৃষ্টি বর্ষণ করে সমূলে ধ্বংস করেছিলেন। ৬. আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পাপিষ্ঠ আখ্যা দিয়ে সেখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে বলেছেন।

[২] ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (٧٩) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (٨١) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٨٣)﴾

[২] ‘(৭৭) আর যখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আসল, তখন তাদের আগমনে তিনি বিষণ্ন হলেন এবং নিজকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলেন আর বললেন, এটা বড় বিপদের দিন। (৭৮) আর তার সম্প্রদায় তার কাছে উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসল এবং আগে থেকেই তারা কুকর্মে ছিল। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। কাজেই তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো সুবোধ ব্যক্তি নেই? (৭৯) তারা বলল, তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; আমরা কী চাই তা তো তুমি জানোই। (৮০) তিনি বললেন, তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের দিকে! (৮১) তারা বলল, হে লূত! নিশ্চয় আমরা আপনার রব প্রেরিত ফেরেশতা। তারা কখনই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। কাজেই আপনি রাতের কোনো এক সময়ে আপনার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ুন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ পেছন দিকে তাকাবে না, আপনার স্ত্রী ছাড়া। তাদের যা ঘটবে, তারও তাই ঘটবে। নিশ্চয় প্রভাত তাদের জন্য নির্ধারিত সময়। প্রভাত কি খুব কাছে নয়? (৮২) অতঃপর যখন আমাদের আদেশ আসল, তখন আমরা জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পোড়ামাটির পাথর, (৮৩) যা আপনার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল। আর এটা যালেমদের থেকে দূরে নয়’ *(হূদ, ১১/৭৭-৮৩)*।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায়: ১. ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে সুদর্শন পুরুষ বেশে লূত আলাইহিস সালাম-এর নিকট তাঁর কওমকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু এই সম্মানিত মেহমানদের ইজ্জত রক্ষার দুশ্চিন্তায় লূত আলাইহিস সালাম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ২. লূত আলাইহিস সালাম-এর সমকামী কওম ঠিকই সেই আগত সুদর্শন মেহমানগণের দিকে দ্রুত ছুটে আসে। ৩. লূত আলাইহিস সালাম তাদেরকে নারীদের সাথে বিবাহপূর্বক পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং তাঁর মেহমানের ব্যাপারে

তাঁকে লাঞ্ছিত করতে নিষেধ করেন। ৪. সমকামীরা কোনো কৈফিয়ত না শুনলে লূত্ব আলাইহিস সালাম তাঁর দুর্বলতার কথা সেই মেহমানদের সামনে বলেন এবং তখনই ফেরেশতামণ্ডলী তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন, তাঁরা আসলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতা। সুতরাং দুষ্কৃতিকারীরা কোনোভাবেই তাঁর কাছে আসতে পারবে না। ৫. ফেরেশতামণ্ডলী লূত্ব আলাইহিস সালাম-কে তাঁর পরিবারবর্গসহ রাতেই ঐ এলাকা ছেড়ে যাওয়া এবং যাওয়ার সময়ে পেছনে না তাকানোর নির্দেশনা প্রদান করেন। ৬. তাঁরা তাঁকে তাঁর স্ত্রীকে রেখে যাওয়ার নির্দেশনা দেন, অথবা সেও সাথে যাবে কিন্তু সে পেছনে তাকাবে এবং সমকামীদের শাস্তির মুখোমুখি হবে মর্মে ঘোষণা দেন। ৭. তাদের ভয়াবহ ও অভূতপূর্ব শাস্তির নির্ধারিত সময় ছিল ঐদিন রাতগত সকালে সূর্যোদয়ের সময়। ৮. নির্ধারিত সময়ে সমকামীদের সাদূম জনপদ উল্টিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের উপর মুহুর্মুহু চিহ্নিত পাথর বর্ষণ করে সাজা দেওয়া হয়। ৯. সমকামীরা যে যালেম, আয়াতগুলোর শেষে সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে অন্য যালেমদেরকেও সাবধান করা হয়েছে।

[৩] ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٥٧) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٥٨) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (٦٠) فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (٦١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٦٢) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (٦٣) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٦٤) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (٦٥) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (٦٦) وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (٦٧) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (٦٨) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (٦٩) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (٧٠) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٧١) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٢) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (٧٤)﴾

[৩] ‘(৫৭) তিনি বললেন, হে প্রেরিত (ফেরেশতা)গণ! আপনাদের আর বিশেষ কী উদ্দেশ্য আছে? (৫৮) তারা বলল, নিশ্চয় আমাদেরকে এক পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে। (৫৯) তবে লূত্বের পরিবারের বিরুদ্ধে নয়, আমরা তো অবশ্যই তাদের সবাইকে রক্ষা করব, (৬০) কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি যে, নিশ্চয় সে পেছনে অবস্থানকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত। (৬১) অতঃপর ফেরেশতাগণ যখন লূত্ব-পরিবারের কাছে আসল, (৬২) তখন লূত্ব বললেন, আপনারা তো অপরিচিত লোক। (৬৩) তারা বলল, না, তারা যে বিষয়ে সন্দিহান ছিল, আমরা আপনার কাছে তা-ই নিয়ে এসেছি; (৬৪) আর আমরা আপনার কাছে সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী। (৬৫) কাজেই আপনি রাতের কোনো এক সময়ে আপনার পরিবারবর্গকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন এবং আপনি তাদের পেছনে চলুন। আর আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনে না তাকায়; আমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হয়েছে, তোমরা সেখানে চলে যাও। (৬৬) আর আমরা তাকে এ বিষয়ে ফয়সালা জানিয়ে দিলাম যে, নিশ্চয় তাদেরকে ভোরে সমূলে বিনাশ করা হবে। (৬৭) আর নগরবাসী উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হলো। (৬৮) তিনি বললেন, নিশ্চয় এরা আমার অতিথি; কাজেই তোমরা আমাকে অপমানিত করো না। (৬৯) আর তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং আমাকে হেয় করো না। (৭০) তারা বলল, আমরা কি দুনিয়ার সকল লোককে আশ্রয় দিতে আপনাকে নিষেধ করিনি? (৭১) লূত্ব বললেন, একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও, তবে আমার এ কন্যারা রয়েছে। (৭২) আপনার জীবনের শপথ! নিশ্চয় তারা তাদের নেশায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছিল। (৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করল; (৭৪) তাতে আমরা জনপদটিকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পোড়ামাটির পাথর-কঙ্কর বর্ষণ করলাম’ *(আল-হিজর, ১৫/৫৭-৭৪)*।

এ আয়াতগুলোতে আগের আয়াতগুলোর বাইরে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে— ১. সমকামীদেরকে পাপিষ্ঠ বলা হয়েছে। ২. তারা তাদের অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা ও উন্মাদনায় নিমজ্জিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ৩. লূত্ব আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রীকে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে। ৪. রাতে এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় লূত্ব আলাইহিস সালাম-কে তাঁর পরিবারবর্গের পেছনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ৫. অন্যান্য শাস্তির মধ্যে বিকট আওয়াজও তাদের উপর আপতিত হয়েছিল বলে স্পষ্ট করা হয়েছে।

[৪] ﴿وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ﴾

[৪] ‘(৭৪) আর লূত্বকে আমরা দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে; নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ ফাসেক্ব সম্প্রদায়’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/৭৪)*।

উল্লিখিত আয়াতটিতে যা পাই: ১. লূত্ব আলাইহিস সালাম-কে মহান আল্লাহ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলেন মর্মে জানানো হয়েছে। ২. তাঁর ক্বওম নোংরা কাজ করত এবং তারা নিকৃষ্ট ও ফাসেক্ব ক্বওম ছিল মর্মে ঘোষণা করা হয়েছে।

[৫] ﴿وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (٤٣) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٤) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (٤٥)﴾

[৫] ‘(৪৩) আর ইবরাহীম ও লূত্বের সম্প্রদায়, (৪৪) আর মাদইয়ানবাসীরা; অনুরূপভাবে মিথ্যারোপ করা হয়েছিল মূসার প্রতিও। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব, (প্রত্যক্ষ করুন) আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি) কেমন ছিল। (৪৫) অতঃপর আমরা বহু জনপদ ধ্বংস করেছি, যেগুলোর বাসিন্দা

ছিল যালেম। ফলে এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে বহু কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং অনেক সুদৃঢ় প্রাসাদও!' *(আল-হাজ্জ, ২২/৪৩-৪৫)*।

[৬] ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦٣) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (١٦٧) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (١٦٨) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٧١) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (١٧٢) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (١٧٣)﴾

[৬] '(১৬০) লূত্বের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, (১৬১) যখন তাদের ভাই লূত্ব তাদেরকে বললেন, তোমরা কি তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না? (১৬২) আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। (১৬৩) কাজেই তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং আমার আনুগত্য করো। (১৬৪) আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছেই আছে। (১৬৫) সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষের সাথে উপগত হও? (১৬৬) আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক। বরং তোমরা তো এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (১৬৭) তারা বলল, হে লূত্ব! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে। (১৬৮) লূত্ব বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের এ কাজের ঘৃণাকারী। (১৬৯) হে আমার রব! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা করুন। (১৭০) তারপর আমরা তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সকলকে রক্ষা করলাম (১৭১) এক বৃদ্ধ ছাড়া, যে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৭২) তারপর আমরা অপর সকলকে ধ্বংস করলাম। (১৭৩) আর আমরা তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট!' *(আশ-শূ'আরা, ২৬/১৬০-১৭৩)*।

এসব আয়াতে নতুন যে তথ্য পাওয়া যায়: ১. লূত্ব আলাইহিস সালাম তাঁর ক্বওমের সামনে যথার্থ যুক্তি উপস্থাপন করে বলেছিলেন, তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে জোড়া (নারী) সৃষ্টি করেছেন, তা ছেড়ে তোমরা কীভাবে পুরুষের কাছে জৈবিক চাহিদা মেটাতে যেতে পারো! ২. স্বভাবজাত বিষয় পরিত্যাগ করে নোংরা কাজ করার কারণে তাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ৩. সমকামী ক্বওম তাদের নবী ও তাঁর অনুসারীগণকে এলাকা থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। কারণ তাঁরা তাদের মন্দ কর্মকে সমর্থন করেননি। ৪. লূত্ব আলাইহিস সালাম তাঁর ক্বওমের নোংরা কাজকে ঘৃণা করে তা থেকে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

[৭] ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٥٥) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٥٦) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (٥٧) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (٥٨)﴾

[৭] '(৫৪) আর স্মরণ করুন লূত্বের কথা, তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা দেখে-শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ? (৫৫) তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। (৫৬) উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, লূত্ব-পরিবারকে তোমরা জনপদ থেকে বহিষ্কার করো, এরা তো এমন লোক, যারা পবিত্র থাকতে চায়। (৫৭) অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ছাড়া, আমরা তাকে অবশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। (৫৮) আর আমরা তাদের উপর ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; সুতরাং ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বর্ষণ কতই না নিকৃষ্ট ছিল!' *(আন-নামল, ২৭/৫৪-৫৮)*।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে নতুন যা পাই: ১. লূত্ব আলাইহিস সালাম তাঁর ক্বওমকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে তাদের নিকট স্পষ্ট প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন, দেখে-শুনে তোমরা কীভাবে নোংরা কাজটি করতে পারো? ২. তাদের এমন অশ্লীল কর্মের মূল কারণ ছিল অজ্ঞতা। সেজন্য তিনি তাদেরকে অজ্ঞ ও মূর্খ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

[৮] ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٢٨) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٩) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (٣٠) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (٣١) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٢) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٣) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٣٤)﴾

[৮] '(২৮) আর স্মরণ করুন লূত্বের কথা, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, নিশ্চয় তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি। (২৯) তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাক। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এটাই বলল, আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন করো—তুমি যদি

সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক। (৩০) তিনি বললেন, হে আমার রব! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। (৩১) আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ ইবরাহীমের কাছে আসল, তারা বলেছিল, নিশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করব, এর অধিবাসীরা তো যালেম। (৩২) ইবরাহীম বললেন, এ জনপদে তো লূত্ব রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কারা আছে, তা আমরা ভালো করে জানি, নিশ্চয় আমরা লূত্বকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, তার স্ত্রীকে ছাড়া; সে তো পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (৩৩) আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত্বের কাছে আসল, তখন তাদের জন্য তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়লেন এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলেন। আর তারা বলল, ভয় করবেন না, দুঃখও করবেন না; আমরা আপনাকে ও আপনার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, আপনার স্ত্রী ছাড়া; সে তো পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত; (৩৪) নিশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীদের উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা পাপাচার করছিল' *(আল-আনকাবূত, ২৯/২৮-৩৪)*।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে নতুন যা পাই: ১. লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর সমকামী সম্প্রদায় শুধু তাদের এলাকার মানুষের সাথেই সমকামিতা করত না; বরং ঐ এলাকায় কোনো মুসাফির আসলে তার সাথেও এ জঘন্য কাজ করার চেষ্টা করত। আর এভাবে তারা মুসাফিরদের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। ২. তারা তাদের ক্লাবে বা জনসমাগমস্থলে সমকামিতা ছাড়াও নানা ধরনের নোংরা কথা ও কাজে লিপ্ত হতো। ৩. লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর দাওয়াত গ্রহণ না করে তাঁর ক্বওম হঠকারিতা প্রদর্শন করে বলেছিল, তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আল্লাহর আযাব আমাদের নিকট নিয়ে এসো। ৪. ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও লূত্ব আলাইহিস সালাম সমসাময়িক নবী ছিলেন; বরং লূত্ব আলাইহিস সালাম ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর ভাতিজা। ৫. যেসব ফেরেশতার মাধ্যমে সমকামীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তারা সর্বপ্রথম ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর কাছে এসেছিলেন এবং তাঁকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়েছিলেন। ৬. সমকামীদেরকে সরাসরি যালেম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ৭. তাদেরকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বলা হয়েছে।

[৯] ﴿وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (١٣٦) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٨)﴾

[৯] '(১৩৩) আর নিশ্চয় লূত্ব ছিলেন রাসূলদের একজন। (১৩৪) স্মরণ করুন, যখন আমরা তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম (১৩৫) পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত এক বৃদ্ধা ছাড়া। (১৩৬) অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম। (১৩৭) আর তোমরা তো ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাক সকালে (১৩৮) ও সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা বোঝ না?' *(আছ-ছফফাত, ৩৭/১৩৩-১৩৮)*।

[১০] ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (١٢) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (١٣) إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (١٥)﴾

[১০] '(১২) এদের আগেও রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ ও কীলকওয়ালা ফেরাউন, (১৩) ছামূদ, লূত্ব সম্প্রদায় ও আইকার অধিবাসী; ওরা ছিল এক-একটি বিশাল বাহিনী। (১৪) তাদের প্রত্যেকেই রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি ছিল যথার্থ। (১৫) আর এরা তো কেবল অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দের, যাতে কোনো বিরাম থাকবে না' *(ছোয়াদ, ৩৮/১২-১৫)*।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে নতুন যা পাই: ১. নূহ আলাইহিস সালাম -এর সম্প্রদায়, আদ, ফেরাউন, ছামূদ, লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর সম্প্রদায় ও আইকার অধিবাসীরা সবাই আল্লাহর নাফরমানী ও কুফরীর ক্ষেত্রে একই ঘাটের মাঝি ছিল। ২. তারা সবাই তাদের রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

[১১] ﴿وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (١٤)﴾

[১১] '(১৩) আর আদ, ফেরাউন ও লূত্ব সম্প্রদায়। (১৪) আর আইকার অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়; তারা সকলেই রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি যথার্থভাবে আপতিত হয়েছে' *(ক্বা-ফ, ৫০/১৩-১৪)*।

[১২] ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٣١) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٣٢) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (٣٣) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤)﴾

[১২] '(৩১) ইবরাহীম বললেন, হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ! আপনাদের বিশেষ কাজ কী? (৩২) তারা বলল, নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হয়েছি, (৩৩) যাতে তাদের উপর নিক্ষেপ করি মাটির শক্ত ঢেলা, (৩৪) যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত আপনার রবের কাছ থেকে' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৩১-৩৪)*।

[১৩] ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (٣٥)﴾

[১৩] '(৩৩) লূত্ব সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল সতর্ককারীদের প্রতি, (৩৪) নিশ্চয় আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম পাথর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত্ব-পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে, (৩৫) আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ; যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আমরা এভাবেই তাকে পুরস্কৃত করে থাকি' *(আল-ক্বামার, ৫৪/৩৩-৩৫)*।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

www.al-itisam.com

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী-৭ম পর্ব)

হাদীছ বর্ণনার পরিভাষায় ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মত:

উপরে আমরা হাদীছ বর্ণনার বিভিন্ন শব্দরূপ সম্পর্কে অবগত হলাম। এই শব্দগুলোর বিষয়ে ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম হুমায়দী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا، وَسَمِعْتُ وَاحِدًا অর্থাৎ 'ইবনু উয়াইনার নিকটে হাদ্দাছানা, আখবারানা, আম্বাআনা ও সামি'তু একই অর্থবোধক'। তথা উপরে আমরা এই শব্দগুলোর ব্যবহারিক যে পার্থক্য তুলে ধরেছি, সেই পার্থক্য ইবনু উয়াইনার কাছে ছিল না। একই মত ইমাম হুমায়দী ও ইমাম বুখারী (রাহিমাহুমাল্লাহ)-এর। আরও স্পষ্ট করে বললে তারা সরাসরি শিক্ষক থেকে হাদীছ শ্রবণের ক্ষেত্রে অথবা ছাত্র যখন শিক্ষকের সামনে হাদীছ পড়েন, সেক্ষেত্রে অথবা যখন ইজাযার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, এক কথায় নির্ভরযোগ্য সকল বর্ণনার মাধ্যমের ক্ষেত্রে তারা হাদ্দাছানা, আখবারানা, আম্বাআনা ও সা'মিতু এই শব্দগুলোর ব্যবহারকে বিশুদ্ধ মনে করতেন।

পরিভাষাগুলো সরাসরি ছাহাবী থেকে প্রমাণিত:

উক্ত পরিভাষাগুলো মুহাদ্দিছদের নিজস্ব আবিষ্কৃত কোনো শব্দ নয়, বরং ছাহাবী ও আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। এটা প্রমাণ করাই ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর উদ্দেশ্য। সেটির প্রমাণে ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) সর্বপ্রথম ছাহাবীদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং সর্বশেষে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বক্তব্য তুলে ধরবেন। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) এখানে তিনজন ছাহাবীর বক্তব্য এনেছেন—

(১) ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, حدثنا رسول الله ﷺ অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের হাদীছ বলেছেন'।

(২) একই হাদীছ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর ছাত্র শাক্বীক্ব আবূ ওয়ায়েল যখন বর্ণনা করেন, তখন তিনি বলেন, سمعت النبي ﷺ كلمةً অর্থাৎ 'আমি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একটি শব্দ বলতে শুনেছি'।

(৩) হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান বলেন, حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ অর্থাৎ 'তিনি আমাদের দুটি হাদীছ বলেছেন'।

এই তিনটি উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, ছাহাবীরা কখনো حدثنا, কখনো سمعت ব্যবহার করতেন; অথচ উভয় ক্ষেত্রেই বক্তব্য সরাসরি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। এমনকি একই হাদীছ বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একটি শব্দ চয়ন করেছেন আর তার ছাত্র আরেকটি শব্দ চয়ন করেছেন। সুতরাং এই শব্দগুলো সমার্থক ও গ্রহণযোগ্য।

'আন' শব্দের ব্যবহার সরাসরি ছাহাবী থেকে প্রমাণিত:

ইবনু আব্বাস, আনাস ও আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম) —তিনজনই হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ থেকে হাদীছে কুদসী বর্ণনা করেছেন বুঝাতে গিয়ে তারা 'আন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারা বলেন, يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ অর্থাৎ 'তিনি তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন'।

فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عز وجل অর্থাৎ 'যা তিনি তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন'।

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ অর্থাৎ 'নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে, তিনি তোমাদের প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন'।

এই উদ্ধৃতিগুলো প্রমাণ করে যে, সাক্ষাৎ বা সংযুক্তির প্রমাণ থাকলে 'আন' শব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মহান আল্লাহর সংযোগের বিষয়টি প্রমাণিত। তিনি জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর অহী পেয়ে থাকেন। সেহেতু এই ধরনের অবিচ্ছিন্ন বা মুত্তাছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে 'আন' শব্দ ব্যবহার করা যায়। 'আন' বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ)-এর মধ্যে মতভেদের উপর বিস্তারিত আলোচনা *মিন্নাতুল বারী ১ম খণ্ডে* করা হয়েছে।

সনদগুলো দিয়ে বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ:

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীছ বর্ণনার পরিভাষা বুঝাতে যে সনদগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর পূর্ণ হাদীছ তিনি উল্লেখ করেননি। কেননা পূর্ণ হাদীছ এখানে তার উদ্দেশ্য নয়। এখানে তার উদ্দেশ্য শুধু হাদীছ কী ধরনের শব্দ দিয়ে বর্ণিত হয়ে থাকে, তা দেখানো। তবে পাঠকদের বুঝার সুবিধার জন্য আমরা উল্লিখিত সনদগুলো দিয়ে বর্ণিত হাদীছের মতন বা টেক্সটগুলো অনুবাদ ও রেফারেন্সসহ দিয়ে দিচ্ছি।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا العَالِيَةِ، حَدَّثَنَا - ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ، يَعْنِي - ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى. وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

সনদ: মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার→ গুনদার→ শু'বা→ ক্বাতাদা→ আবুল আলিয়া→ ইবনু আব্বাস→ রাসূল ﷺ।

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কারও জন্য এটা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস ইবনু মাত্তা-এর চেয়ে উত্তম'।[১]

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

সনদ: শু'বা→ ক্বাতাদা→ আনাস رضي الله عنه।

অনুবাদ: নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'যদি কোনো বান্দা আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। সে এক হাত এগিয়ে এলে, আমি এক গজ (দুই হাত) এগিয়ে যাই আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে আসি'।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ، قَالَ: لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ.

সনদ: আদম→ শু'বা→ মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ→ আবূ হুরায়রা رضي الله عنه।

অনুবাদ: রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'প্রত্যেক আমলের জন্য একটি করে কাফফারা আছে; কিন্তু ছিয়াম আমার জন্য, আর আমিই এর প্রতিদান দেব। আর ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম'।[২]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ: حَدَّثَنَا: أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ: فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلاَنًا وَفُلاَنًا.

সনদ: মুহাম্মাদ ইবন কাছীর→ সুফিয়ান→ আ'মাশ→ যায়েদ→ ইবন ওয়াহহাব→ হুযায়ফা→ রাসূল ﷺ।

সারমর্ম অনুবাদ: হুযায়ফা رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দুটি হাদীছ বলেছেন। আমি একটি বাস্তবে দেখেছি এবং অন্যটির প্রতীক্ষায় আছি। তিনি বলেছিলেন, 'আমানত প্রথমে মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত করা হয়েছিল, পরে তারা কুরআন শিক্ষা পায়, এরপর তারা সুন্নাহ শিক্ষা পায়'।

তিনি আমানত উঠে যাওয়া সম্পর্কে বলেছেন, 'একটা সময় আসবে, যখন লোকেরা ঘুমাবে আর তাদের হৃদয় থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে এমনভাবে যে, শুধু আগুনের দাগের মতো দাগ থাকবে। তারপর সে আবার ঘুমাবে, অতঃপর (তার অন্তর থেকে অবশিষ্ট আমানতও) উঠিয়ে নেওয়া হবে, তখন তার দাগ হবে ফোসকার মতো যেমন তুমি কোন অঙ্গার পায়ে ফেললে পা ফোসকা পড়ে যায়, যা তুমি স্ফীত দেখতে পাও অথচ তার ভিতরে কিছুই থাকে না। অতঃপর মানুষ ব্যবসা করবে, কিন্তু প্রায়ই কেউই আমানত রক্ষা করবে না। সে সময় বলা হবে, 'অমুক গোষ্ঠীতে একজন লোক আছে, সে বিশ্বস্ত। সেই ব্যক্তিকে বলা হবে, 'তিনি কত বুদ্ধিমান, কত বিচক্ষণ, কতো শক্তিমান কিন্তু তার হৃদয়ে এক সরিষা দানার সমানও ঈমান থাকবে না'।

আমার এমন একটা সময় গেছে, যখন আমি কারো সাথে লেনদেন করতে পরওয়া করিনি। যদি সে মুসলিম হয়, তবে ইসলাম তাকে আমার উপর যুলম করা থেকে বিরত রাখবে। আর যদি সে খ্রিষ্টান হয়, তবে দায়িত্বশীল তাকে আমার উপর যুলম করা থেকে বিরত রাখবে। আর বর্তমানে আমি কেবল অমুক, অমুকের সাথে ব্যবসা করি'।[৩]

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ.

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৯৫।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৩৮।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯৭।

সনদ: হাসান ইবন রাবী→ আবুল আহওয়াস→ আ'মাশ→ যায়েদ ইবন ওয়াহহাব→ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু।

সারমর্ম অনুবাদ: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমাদেরকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যিনি সত্যবাদী ও সত্যায়িত হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের সৃষ্টি তার মায়ের গর্ভে ৪০ দিন শুক্ররূপে, এরপর ৪০ দিন রক্তবিন্দু, তারপর ৪০ দিন মাংসপিণ্ডরূপে থাকে। এরপর এক ফেরেশতা পাঠানো হয়, তাকে চারটি বিষয় লেখার আদেশ দেওয়া হয়— তার আমল, তার রিযিক, তার আয়ু এবং সে ভাগ্যবান, না দুর্ভাগা হবে। এরপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়'।

এরপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের কোনো ব্যক্তি আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে কেবল এক হাত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, অতঃপর তার ভাগ্যলিপি তার উপর বিজয়ী হয়, ফলে সে জাহান্নামীদের আমল করে (জাহান্নামে প্রবেশ করে)। আবার কোনো ব্যক্তি আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে কেবল এক হাত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, অতঃপর তার উপর ভাগ্যলিপি বিজয়ী হয়, ফলে সে জান্নাতীদের আমল করে (জান্নাতে প্রবেশ করে)। আবার কোন ব্যক্তি (পাপের) আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে কেবল এক হাত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, অতঃপর তার উপর ভাগ্যলিপি তার উপর বিজয়ী হয়, ফলে সে জান্নাতীদের আমল করে (জান্নাতে প্রবেশ করে)'।[৪]

ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ شَقِيقٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا القُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ.

সনদ: ইবনু জুরাইজ→ আবদা→ শাক্বীক্ব→ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু।

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'এটা খুবই খারাপ কথা যে, কেউ বলবে, আমি অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং বলা উচিত, ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুরআন পড়া অব্যাহত রাখবে! কারণ এটা মানুষের বক্ষসমূহ থেকে উটের চেয়েও দ্রুত হারিয়ে যায়'।

দুটি সূক্ষ্ম জ্ঞাতব্য:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বর্ণিত ইউনুস ইবন মাত্তার হাদীছে ছহীহ বুখারীর রেওয়ায়াতে 'যা তিনি আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন' কথাটি উল্লেখ নেই। তবে মুসনাদে আহমাদের রেওয়ায়াতে 'আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন' এই বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। হয়তো এই রেওয়ায়াতকে সামনে রেখেই ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এই অধ্যায়ে কথাটি যুক্ত করেছেন।

وَقَالَ لَنَا الحُمَيْدِيُّ অর্থাৎ আমাকে হুমায়দী বলেছেন, সাধারণত ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তা'লীক্ব বা টীকা সংযোজনের ক্ষেত্রে 'ক্বলা' শব্দ ব্যবহার করেন। তবে এটি টীকা নয়, কেননা হুমায়দী সরাসরি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর উস্তায। সুতরাং এটি একটি মুসনাদ বর্ণনা। তবুও তিনি কেন 'হাদ্দাছানা' না বলে 'ক্বলা' বললেন, তার ব্যাখ্যায় অনেকেই বলেছেন, কোনো হাদীছ যদি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ আনুষ্ঠানিক দারস থেকে শ্রবণ করে থাকেন, তাহলে 'হাদ্দাছানা' ব্যবহার করেন আর যদি অনানুষ্ঠানিকভাবে গল্পের মধ্যে বা মুযাকারায় হাদীছ শুনে থাকেন, তাহলে 'ক্বলা লানা' বলে থাকেন। মহান আল্লাহ-ই অধিক অবগত।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু	অন্যান্য জিনিস
সরিষা ফুলের মধু	আখের গুড়
লিচু ফুলের মধু	মৌসুমের খেজুরের গুড়
বরই ফুলের মধু	মধুময় বাদাম
কালোজিরা ফুলের মধু	উন্নত মানের খেজুর
মিক্স ফুলের মধু	সরিষার তেল
পাহাড়ী ফুলের মধু	কালোজিরা তেল
সুন্দরবন বিখ্যাত খলিশা ফুল	জয়তুন তেল
চাকের মধু	যবের ছাতু
	দানাদার ঘি
	বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২
প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun
১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩২০৮।

ঈদে মীলাদুন নবী: পরিচয়, উৎপত্তি, শারঈ হুকুম ও করণীয়

-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ*

ভূমিকা:

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যা কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলিমদের যাবতীয় ইবাদত, উৎসব ও আনুষ্ঠানিকতা এই দুটি মূল উৎসের ভিত্তিতে পরিচালিত। আজকাল হিজরী বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে মুসলিমসমাজে 'ঈদে মীলাদুন নবী' নামে একটি দিনকে ঈদ হিসেবে পালন করা হয়, যা নবী ﷺ-এর জন্মদিন হিসেবে পরিচিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই দিবসটি পালন করা কি ইসলামী শরীআতে দলীলসম্মত? রাসূল ﷺ নিজে কিংবা তাঁর ছাহাবীরা কি কখনো এই দিন পালন করেছেন?

ইতিহাস ও হাদীছ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঈদে মীলাদুন নবী পালনের প্রচলন বহু বছর পর চালু হয়েছে, যা ইসলামের মূল আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই প্রবন্ধে ঈদে মীলাদুন নবীর পরিচয়, উৎপত্তি, শারঈ হুকুম ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

'ঈদে মীলাদুন নবী'-এর পরিচয়:

'ঈদে মীলাদুন নবী' একটি বহুল প্রচলিত পরিভাষা। এ নামটি তিনটি আরবী শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, শব্দ তিনটি হলো عيد (ঈদ), ميلاد (মীলাদ) ও النبي (নবী)।

ঈদ (عيد)-এর পরিচিতি:

আভিধানিক অর্থ: عيد শব্দটি আরবী, বহুবচনে أَعْيَاد; যার অর্থ হলো বারংবার ফিরে আসা, সমবেত হওয়া, আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ: ঈদ-এর সংজ্ঞায় শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَنَّ الْعِيدَ اسْمٌ لِمَا يَعُودُ مِنَ الِاجْتِمَاعِ الْعَامِّ عَلَى وَجْهٍ مُعْتَادٍ، عَائِدٌ: إِمَّا بِعَوْدِ السَّنَةِ، أَوْ بِعَوْدِ الْأُسْبُوعِ، أَوِ الشَّهْرِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

'ঈদ এমন সমাবেশের নাম- যা বছর, মাস, সপ্তাহ বা এরকম কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ফিরে আসে'।[১] এই ঈদ সময়কেন্দ্রিক, আবার স্থানকেন্দ্রিকও হয়ে থাকে।

মীলাদুন নবী (ميلاد النبي) -এর পরিচিতি:

আভিধানিক অর্থ: ميلاد (মীলাদ) শব্দটি আরবী, যার অর্থ জন্ম বা জন্মকাল আর النبي (নবী) শব্দটি আরবী হলেও তা সকল মুসলিমের বোধগম্য। উদ্দেশ্য হলো নবী মুহাম্মাদ ﷺ। সুতরাং 'ঈদে মীলাদুন নবী'-এর অর্থ হলো নবী ﷺ-এর জন্মে খুশি বা উৎসব।

পারিভাষিক অর্থ: নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্ম উপলক্ষ্যে যে আনুষ্ঠানিকতা বা উৎসব পালন করা হয়, তাকে ঈদে মীলাদুন নবী বলা হয়।

সাধারণত, বর্তমানে ১২ রবীউল আউয়ালকে শেষ নবী ﷺ-এর জন্মদিন ধরে কিছু সুবিধাবাদী আলেমের পৃষ্ঠপোষকতায় ওয়ায-নছীহত, যিকির-আযকার ও ক্বিয়াম করে পরিশেষে মিষ্টিমুখ করে যে অনুষ্ঠান ত্যাগ বা সমাপ্ত করা হয়, সেটাই হলো ঈদে মীলাদুন নবী।

'ঈদে মীলাদুন নবী'-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ:

ঈদে মীলাদুন নবীর ভিত্তি কুরআন ও ছহীহ হাদীছে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইতিহাসের পাতায় তাকালে দেখা যায় প্রাক ইসলামী যুগেও এ জাতীয় আচার-অনুষ্ঠান ছিল, যেমন— গ্রীক, ইউনান, ফারা'এনা ইত্যাদি সভ্যতায় তারা স্বীয় দেবতার অনুষ্ঠান উদযাপন করত। তাদের থেকে গ্রহণ করেছে তাদের পরবর্তী খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। যাদের কাছে বড় ঈদ হলো তাদের নবীর জন্ম উৎসব পালন করা। খ্রিষ্টানদের জন্মোৎসব বা বড় দিবসের অনুষ্ঠান শুধু প্রাক ইসলামী যুগেই পালন করা হতো না; বরং আজও তারা পালন করে চলেছে, সেখান থেকেই অনুসৃত হয়ে মুসলিম সমাজে এসেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, কখন থেকে মুসলিম সমাজে এ অনৈসলামিক রীতির অনুপ্রবেশ ঘটল এবং কার মাধ্যমে ঘটল?

সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদুন নবী উদযাপন: ঈদে মীলাদুন নবী এর পক্ষে ও বিপক্ষে সকল আলেম একমত যে, এ মীলাদুন নবীর উৎসব নবী, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈদের মাধ্যমে কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। অবশ্যই এসব উত্তম যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর এ বিদআতের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু কোন সময় এবং কার মাধ্যমে এ বিদআতের উদ্ভব ঘটল, এ নিয়ে ইসলামী মনীষীগণ দুটি মত ব্যক্ত করেছেন—

(ক) হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে সর্বপ্রথম মিসরে ফাতেমীয় সাম্রাজ্যে এ বিদআতের উদ্ভব ঘটে। তারা সর্বপ্রথম ছয়জন ব্যক্তির জন্মোৎসব পালন করে। তারা হলেন— ১. নবী ﷺ, ২. আলী, ৩. হাসান, ৪. হুসাইন, ৫. ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু আনহুম ও ৬. তৎকালীন ফাতেমীয় সম্রাজ্যের খলীফা। তখন হতে ফাতেমীয় বা শীআ সম্প্রদায়ের খলীফাগণ নিজ উদ্যোগে জাতীয়ভাবে ছয়জনের জন্মদিবস পালন করতেন।[২]

---

* অধ্যয়নরত, আক্বীদা ও দাওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. ড. শহীদুল্লাহ খাঁন মাদানী, ঈদে মীলাদুন্নাবী, পৃ. ৪।

২. আল-খিতাত লিল মাকরীযী, ১/৪৯০-৪৯৯।

(খ) হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে ইরাকের মাওছেল বা মোছেল শহরে তৎকালীন বাদশাহ আল-মুযাফফার-এর পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী আলেম উমার ইবনে মুহাম্মাদ মোল্লা-এর পরিচালনায় সর্বপ্রথম নবী ﷺ-এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।[৩]

ইমাম আবূ শামাহ (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত দুটি মতের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেন, বস্তুত সর্বপ্রথম যারা এ বিদআতের উদ্ভব ঘটায়, তারা হলো ফাতেমী বা শীআ সম্প্রদায়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে তারা মিসরের রাজধানী কায়রোতে এ বিদআতের আবির্ভাব ঘটায়, অতঃপর সেখান থেকে ফাতেমী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লে ইরাকের মাওছেল শহরে সর্বপ্রথম বাদশাহ মুযাফফার-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিদআত চালু হয়। যদিও অন্য অঞ্চলে তা আগেই উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু ইরাকে মাওছেল শহরে তার মাধ্যমেই প্রথম চালু হয়।[৪]

আরেক বর্ণনা মতে, ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হি.) কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের 'এরবেল' এলাকার গভর্নর আবূ সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকবুরী (৫৮৬-৬৩০ হি.) সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরীতে, মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান, যা ছিল রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা ঈদে মীলাদুন নবী উদযাপনের নামে নাচ-গানসহ চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হতো। গভর্নর নিজে নাচে অংশ নিতেন। আর এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব উমার ইবনে দেহইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হি.)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানোয়াট হাদীছ জমা করে বই লেখেন এবং ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ পান।[৫]

'ঈদে মীলাদুন নবী' পালন করার শারঈ হুকুম:

ঈদে মীলাদুন নবী উদযাপন করা একটি সুস্পষ্ট বিদআত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো ঈদে মীলাদুন নবী পালন করেননি এবং করতেও বলেননি। চার খলীফাসহ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন ছাহাবীর কেউ এ অনুষ্ঠান পালন করেননি। লক্ষাধিক ছাহাবীর কোনো একজনও এ উৎসব পালন করেননি। পরবর্তী যুগের তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈনও এটা পালন করেননি। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম (রহিমাহুমাল্লাহ)-সহ হাদীছগ্রন্থ সংকলনকারী মুহাদ্দিছগণও পালন করেননি। এমনকি চার মাযহাবের ইমামগণের কোনো একজনও এ ঈদ পালন করেননি।[৬] তারা কেউ পালন করেছেন মর্মে কোনো প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। সুতরাং বলা যায়, ঈদে মীলাদুন নবী নতুন আবিষ্কার।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। এ দ্বীন পরিপূর্ণ, বিধায় আমাদেরকে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিদআত থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর বিদআতকারীর ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরীআতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৭] তিনি আরও বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদআত ও প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী'।[৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ 'আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম'।[৯] সুতরাং ঈদে মীলাদুন নবী পালন করা বিদআত। কেননা এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর প্রায় ৫৯৪ বছর পর ৬০৪ হিজরীতে আবিষ্কৃত হয়।

'ঈদে মীলাদুন নবী' সম্পর্কে কতিপয় বিদ্বানের অভিমত:

(১) শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لَا يَجُوزُ الِاحْتِفَالُ بِمَوْلِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَلَا غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الْمُحْدَثَةِ فِي الدِّينِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَفْعَلْهُ، وَلَا خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ، وَلَا غَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلَا التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ فِي الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ، وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ، وَأَكْمَلُ حُبًّا لِرَسُولِ اللهِ، وَمُتَابَعَةً لِشَرْعِهِ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ.

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মীলাদ বা অন্য কারও মীলাদ উদযাপন করা জায়েয নেই। কারণ এটি দ্বীনের মধ্যে সৃষ্ট নতুন বিদআত। রাসূল ﷺ এটি করেননি, তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনও করেননি, অন্য কোনো ছাহাবীও করেননি এবং মর্যাদাপূর্ণ যুগে তাদের ন্যায়সঙ্গত অনুসরণকারীগণও (তাবেঈ) করেননি। অথচ তারা ছিলেন সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সর্বাধিক ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এবং তাঁর শরীআতের অনুসরণে পরবর্তীদের চেয়ে অধিক অগ্রগামী'।[১০]

(২) আল্লামা ইবনু উছায়মীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

إِنَّ الِاحْتِفَالَ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ لَيْسَ مَعْرُوفًا عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَلَا فَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَلَا فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ، وَلَا التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلَا أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ.

---

৩. সুয়ূতী, হুসনুল মাক্বছাদ, পৃ. ৪২; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১৩/১৪৭।
৪. আবূ শামাহ, আল-বা'এছ আলা ইনকারিল বিদা' ওয়াল হাওয়াদিছ, পৃ. ২৩-২৪; বিস্তারিত: আল-আইয়াদ ওয়া আছারুহা আলাল মুসলিমীন, পৃ. ২৮৬-২৮৯।
৫. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১৩/১৩৭।
৬. আব্দুস সাত্তার দেহলভী, মীলাদুন্নাবী, পৃ. ৩৫।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮।
৮. আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭; তিরমিযী, হা/২৬৭৬; মিশকাত, হা/১৬৫।
৯. নাসাঈ, হা/১৫৭৮।
১০. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায, ১/১৭৮।

‘নিশ্চয়ই নবী ﷺ-এর জন্মদিন উদযাপন সালাফে ছালেহীনের মধ্যে পরিচিত ছিল না। আর না খুলাফায়ে রাশেদীন তা করেছিলেন, না ছাহাবীগণ তা করেছিলেন, না তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে অনুসরণকারী তাবেঈন তা করেছিলেন আর না তাদের পরবর্তী মুসলিম ইমামগণ তা করেছিলেন’।[১১]

(৩) শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান বলেন,

الِاحْتِفَالُ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ بِدْعَةٌ فِي الدِّينِ.

‘নবী ﷺ-এর জন্মদিন উদযাপন করা দ্বীনের মধ্যে বিদআত।[১২]

‘ঈদে মীলাদুন নবী’ উপলক্ষ্যে মুসলিম সমাজে প্রচলিত কর্মকাণ্ড:

(১) মিছিল ও শোভাযাত্রা: বর্তমানে ঈদে মীলাদুন নবী-তে বহু মুসলিম দেশে বড় বড় শোভাযাত্রা ও মিছিল বের করা হয়। রাস্তাজুড়ে ব্যানার, ফেস্টুন, গাড়ি সাজানো হয়। ইসলামী সংগীত বাজানো হয় ব্যান্ড দলের মাধ্যমে। অনেক সময় এসব আয়োজন রাস্তার যান চলাচল বন্ধ করে দেয়, সড়কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং মহিলাদের অংশগ্রহণ, উচ্চ আওয়াজে গান-বাজনা, ঢাকঢোল ইত্যাদির মাধ্যমে অসংযত পরিবেশ তৈরি হয়, যা ইসলামী আদব ও শরীআতের সুন্নাহসম্মত জীবনধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ঈদে মীলাদুন নবী-এর নামে এসব কর্মকাণ্ড কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না।

(২) মীলাদ মাহফিল ও ক্বাছীদা পাঠ: মীলাদ মাহফিল উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ নানা ধরনের পাপে লিপ্ত হয়। যেমন— নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ, গান-বাজনা ও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি। সর্বোপরি এসব মাহফিলে শিরকে আকবার তথা বড় ধরনের শিরকও সংঘটিত হয়ে থাকে। আর তা হলো রাসূল ﷺ ও অন্যান্য আউলিয়া কেরামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা, তাদের কাছে দু‘আ করা, সাহায্য চাওয়া, বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করা এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, তারা গায়েবের খবর জানেন। অথচ এই সমস্ত কাজ করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়। এমনকি নবী ﷺ-এর জন্ম, জীবনী নিয়ে বক্তৃতা, গান (ক্বাছীদা), কবিতা, নাটিকা ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়।

(৩) তবারুক বা বিশেষ খাবার বিতরণ: মহানবী ﷺ-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বর্তমানে অনেক জায়গায় নবী ﷺ-এর নামে বিভিন্ন ধরনের মজাদার খাবার তৈরি করে তা বিতরণ করা হয়। সাধারণত এটি তবারুক বা বরকত হিসেবে নবী ﷺ-এর নামে করা হয়। মানুষ মনে করে, নবী ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে এই খাবার বিতরণ একটি সুনিশ্চিত সৎ কাজ। কিন্তু ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীছের আলোকে বিষয়টি মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, এটি একটি বিদআত (নতুন উদ্ভাবন) অর্থাৎ নবী ﷺ বা ছাহাবীগণের যুগে চালু বা সুপ্রচলিত ছিল না।

(৪) গান-বাজনা ও আলোকসজ্জা: বিভিন্ন মসজিদ, রাস্তা, গলি এবং বাড়িঘরকে বর্ণিলভাবে সাজানো হয়, বিভিন্ন রঙের বাতি ও লাইটিং করে আনন্দ উদযাপন করা হয়। এতে প্রচুর অর্থ অপচয় করা হয়। অথচ ইসলামী শরীআতে এই ধরনের অপসাংস্কৃতিক আয়োজন বা বাহ্যিক চাকচিক্য ও অপচয় কখনো উৎসাহিত করা হয়নি। এমনকি কিছু এলাকায় গান-বাজনা, আতশবাজি, নাচ, আলোকসজ্জা ইত্যাদি করতে দেখা যায়, যা শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক।

(৫) নবী ﷺ-এর ‘আত্মা’ আগমন করে এই বিশ্বাস করা: অনেকের ধারণা, রাসূল ﷺ মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। আবার কেউ মনে করে, ঐ রাতে নবী ﷺ-এর রূহ আগমন করেন (নাঊযুবিল্লাহ!)। তাই তারা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে দাঁড়িয়ে যায়। এটা বিরাট মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসূল ﷺ ক্বিয়ামত দিবসের পূর্বে আপন কবর থেকে বের হবেন না বা কারও সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ করবেন না এবং কোনো সমাবেশেও উপস্থিত হবেন না। বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত অন্যান্য নবীর মতোই স্বীয় কবরে অবস্থান করবেন। রাসূল ﷺ বলেন, أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ ‘ক্বিয়ামতের দিন আমি আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান। আমার কবরই সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করা হবে। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সবার আগে গৃহীত হবে’।[১৩]

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে ১২ রবীউল আউয়ালকে তৃতীয় ঈদ হিসেবে পালন করা হয়। তবে ইসলামী শরীআতে ঈদ মাত্র দুটি— ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। নবী ﷺ-এর জন্মদিন হিসেবে এই দিনকে পালন করার জন্য ‘জশন-ই-বেলাদাত’ নামে অনুষ্ঠান, মীলাদ, মাহফিল ও জুলুসের আয়োজন করা হয়। এগুলোর কোনোটাই কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত নয়।

উপসংহার:

ইসলামে ইবাদত ও উৎসব নির্ধারিত হয় কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা। তাই নিজের পক্ষ থেকে নতুন কোনো ইবাদতের পদ্ধতি বা দিন নির্ধারণ করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। বিদআত পরিহার করে সুন্নাহর উপর অবিচল থাকাই প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মদিবস পালন নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে তাঁকে অনুসরণই কাম্য। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ ও সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১১. মাজমূ‘ ফাতাওয়া ইবনে উছায়মীন, ২১/৬২।

১২. আল-ইজলাল আল-ইলমী ওয়াল আমালী, পৃ. ১৫২।

১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৭৮।

কালো যাদু ও বদনযর নিয়ে কিছু কথা

-সাঈদুর রহমান*

দিন যত যাচ্ছে, তত মানুষের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, রাগ ও অহংকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে একজন আরেকজনের ক্ষতি করার জন্য, একজন আরেকজনকে হত্যা করার জন্য কালো যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করছে। এই যাদুর প্রভাব থেকে কীভাবে বাঁচা যাবে, তা নিয়ে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কিছু দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মানুষ যেন সমস্যার সম্মুখীন না হয় এজন্য ইসলাম আগে থেকেই সতর্ক করেছে। মানুষের যেন কেউ ক্ষতি করতে না পারে এজন্য নবী ﷺ আগে থেকেই সব কিছু বলে দিয়েছেন। প্রবন্ধটি শুরু করার আগে কিছু কথা না বললেই নয়।

মানুষের দুই ধরনের শত্রু রয়েছে— (১) মানুষ শত্রু আর (২) জিন শত্রু। মানুষ শত্রু আমাদের সাথেই চলাফেরা করে। তাকে দুচোখে দেখা যায়। আমাদের সাথে মিশে। মাঝেমধ্যে মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলে। এই শত্রু ভালোমন্দ বুঝে। নিজের লাভ-লোকসান আঁচ করতে পারে। কিছু উপহার দিলে বা তাকে সম্মান করলে সে আনন্দিত হয়। এই শত্রুকে আমাদের করতলগত করার পন্থা আল্লাহ তাআলা বাতলে দিয়েছেন। এই শত্রুকে দুভাবে কাবু করা যায়।

(১) উপহার বা উপঢৌকন দিলে: নবী ﷺ বলেন,تَهَادُوْا تَحَابُّوْا ‘উপহার দাও, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে’।[১] আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ ‘আর ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত করো তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু’ *(ফুছছিলাত, ৪১/৩৪)*।

(২) সালাম দিলে: নবী ﷺ মদীনায় আগমন করলেন। তাঁর আসার আগে মদীনাতে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় হরহামেশা দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত থাকত। সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে তারা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। নবী ﷺ মদীনায় এসে তাদের পরস্পরের শত্রুতার তিক্ততা সালামের মিষ্টতার মাধ্যমে শেষ করলেন। নবী ﷺ ব্যাপকভাবে ঘোষণা করলেন, لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ‘মুমিন না হলে তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে না। আর একে অপরকে ভালো না বাসলে মুমিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় বাতলে দিব না, যা করলে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে? তোমাদের মাঝে সালামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটাও’।[২]

মানুষের দ্বিতীয় শত্রু হলো শয়তান। শয়তান আমাদের সাথে চলাফেরা করে না। আমাদের সাথে থাকে না। আমরা তাকে দেখি না। সে উপহার বা উপঢৌকন গ্রহণ করে না। সালাম দিলে কোনো কাজ হবে না। তাকে দেখা-ই যায় না, আবার সালাম দিব কীভাবে? শয়তানকে আমরা দেখি না ঠিকই, কিন্তু শয়তান আমাদেরকে ভালো করেই দেখে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ‘সে (শয়তান) ও তার দলবল তোমাদের দেখতে পায়; কিন্তু তোমরা তাদের দেখতে পাও না। আমরা শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি, যারা ঈমান আনে না’ *(আল-আ'রাফ, ৭/২৭)*।

শয়তানকে যেহেতু দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, সেহেতু তাকে প্রতিহত করতে হবে এমন এক সত্তার মাধ্যমে, যিনি শয়তানকে দেখেন; কিন্তু শয়তান তাঁকে দেখতে পায় না। বলুন তো তিনি কে? হ্যাঁ, তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। শয়তানকে কাবু করতে হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। কারণ সে মানুষের মতো শত্রু নয়। উপহার বা উপঢৌকন ও সালাম গ্রহণ করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ‘শয়তানের কোনো ধোঁকা টের পেলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। কেননা তিনি সবকিছু শ্রবণ করেন ও জানেন’ *(ফুছছিলাত, ৪১/৩৫)*।

আল্লাহ তাআলা বলেন,- ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ ‘আর (হে নবী!) বলুন, হে আমার রব! শয়তানদের খোঁচা (প্ররোচনা) থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তান আমার কাছে উপস্থিত হওয়া থেকে’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৯৭-৯৮)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ ‘মুত্তাক্বীদের শয়তানের কোনো দল ধোঁকা দিলে তারা (আল্লাহকে) এমনভাবে স্মরণ করে যেন তারা দেখছে’ *(আল-আ'রাফ, ৭/২০১)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ‘যখন কুরআন পড়বে, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে’ *(আল-নাহল, ১৬/৯৮)*।

আমাদের উপর যেন যাদুর প্রভাব না পড়ে এজন্য নবী ﷺ কিছু আমল শিখিয়ে গেছেন। আমরা যদি নিয়মিত বিশ্বাসের

---

* সাবেক শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ছহীহুল জামে', হা/৩০০৪।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৪।

সাথে এই আমলগুলো করতে পারি, তাহলে যাদুকর যতই যাদু করুক না কেন, তা কোনো কাজে আসবে না। চলুন! আমলগুলো জেনে নেই—

(১) সূরাতুল ইখলাছ, আন-নাস ও আল-ফালাক্ব পড়া: ফজর ও মাগরিব ছালাতের পর এই তিনটি সূরা তিনবার করে ৯ বার পড়বেন। আর বাকি তিন ছালাতের পর তথা যোহর, আছর ও এশার ছালাতের পর এই তিনটি সূরা একবার করে পড়বেন। রাতে ঘুমানোর সময় এই তিনটি সূরা তিনবার পড়ে হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে মাথার উপর থেকে সমস্ত শরীরে হাত বুলাবেন। তারপর আবার তিনবার পড়ে একইভাবে হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে মাথার উপর থেকে সমস্ত শরীরে হাত বুলাবেন। আবার তিনবার পড়ে একইভাবে হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে মাথার উপর থেকে সমস্ত শরীরে হাত বুলাবেন।

(২) আয়াতুল কুরসী পড়া: প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়া এবং রাতে ঘুমানোর সময় শুয়ে আয়াতুল কুরসী পড়া।

(৩) রাতে সূরা আল-বাক্বারা পড়া: নবী ﷺ বলেন, لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ‘তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবর সদৃশ করে রেখো না। নিশ্চয় শয়তান যে ঘরে সূরা বাক্বারা পাঠ করা হয়, সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায়’।[৩]

(৪) সূরা আল-বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পড়া: রাতে কেউ যদি সূরা আল-বাক্বারা সম্পূর্ণ করতে না পারেন, তাহলে কমপক্ষে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত অবশ্যই পাঠ করবেন। নবী ﷺ বলেন, مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ‘কেউ যদি রাতে সূরা আল-বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করে, সেটাই তার জন্য যথেষ্ট’।[৪]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কেউ রাতে সূরা আল-বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পড়লে শয়তান ওই রাতে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৫]

(৫) নিচের দু‘আটি দিনের মাঝে ১০০ বার পড়া: নবী ﷺ বলেন,

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

‘যে লোক ১০০ বার এ দু‘আটি পড়বে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য আর তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান), তাহলে ১০টি গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব তার হবে। তার জন্য ১০০ ছওয়াব লেখা হবে এবং ১০০ গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে সুরক্ষিত থাকবে। কোনো লোক তার চেয়ে উত্তম ছওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু‘আটির আমল বেশি পরিমাণ করবে’।[৬]

সকালে ফজর ছালাতের পর এই দু‘আটি ১০০ বার পড়ে নিবেন, তাহলে সারাদিন আর শয়তান আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

(৬) রাতে ঘরে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলা এবং খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা: নবী ﷺ বলেন,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ . وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.

‘যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান হতাশ হয়ে (তার সঙ্গীদের) বলে, তোমাদের (এখানে) রাত্রিযাপনও নেই, খাওয়াও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলে, তোমরা থাকার স্থান পেয়ে গেলে। আর যখন সে খাবারের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন সে (শয়তান) বলে, তোমাদের নিশি যাপন ও রাতের খাওয়ার আয়োজন হলো’।[৭]

(৭) পায়খানায় যাওয়ার সময় নিচের দু‘আটি পড়া: নবী ﷺ যখন পায়খানায় যেতেন, তখন নিচের দু‘আটি পাঠ করতেন,[৮] اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ এই দু‘আটি পাঠ করলে শয়তান মানুষকে কোনো ওয়াসওয়াসা দিতে পারে না।

(৮) বাচ্চাদের যেন কালো যাদু ও বদনযর না লাগে এজন্য নিচের দু‘আটি পড়ে তাদের ফুঁক দেওয়া:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি’।[৯] নবী ﷺ হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে এই দু‘আ পড়ে ফুঁক দিতেন।

---

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৮০।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫০০৯।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫০০৯।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৯৩।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২০১৮।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৪২।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৭১।

উপরের আমলগুলো যদি আপনি নিয়মিত করে যান এবং সাথে সাথে সকাল ও সন্ধ্যার দু'আগুলো পাঠ করেন, তাহলে আপনি কালো যাদু ও বদনযর থেকে রক্ষা পাবেন, ইনশা-আল্লাহ!

শয়তান কোথায় থাকে?

শয়তান দুটি জায়গায় বেশি অবস্থান করে—

(১) খালি ও পরিত্যক্ত ঘরে: এটা আমরা বুঝতে পারি নিচের হাদীছ থেকে। নবী ﷺ বলেন, فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ‘একটি শয্যা পুরুষের, দ্বিতীয় শয্যা তার স্ত্রীর, তৃতীয়টি অতিথির জন্য আর চতুর্থটি (যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়) শয়তানের জন্য’।[১০]

হাদীছে নবী ﷺ অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ চতুর্থ ঘরটিকে শয়তানের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এজন্যই দেখা যায়, যারা গ্রামের বাড়িতে বড় বড় বিল্ডিং বানিয়ে শহরে অবস্থান করে, তাদের ওই বাড়িগুলোতে শয়তান বসবাস করে।

(২) অন্ধকার স্থানে: এটা আমরা বুঝতে পারি নিচের হাদীছ থেকে। নবী ﷺ বলেন,

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ ـ أَوْ أَمْسَيْتُمْ ـ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ.

‘যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে’ অথবা বলেছেন, ‘যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে আটকে রাখবে। কেননা এসময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হবে, তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না’।[১১]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীছ থেকে বুঝা যায়, শয়তান অন্ধকার স্থানে বসবাস করে।[১২]

শয়তান তাড়াবেন কীভাবে?

শয়তান দুইভাবে তাড়ানো যায়—

(১) আযান দেওয়ার মাধ্যমে: যেই ঘরে শয়তান বসবাস করে, ওই ঘরে আযান দিবেন। কারণ শয়তান আযান শুনতে পারে না। আযান দিলে চলে যায়। হাদীছ থেকে এর প্রমাণ দেখুন। নবী ﷺ বলেন,

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى.

‘যখন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন ছালাতের জন্য ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়। ইক্বামত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে, এটা স্মরণ করো, ওটা স্মরণ করো। বিস্মৃত বিষয়গুলো সে মনে করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে কয় রাকআত ছালাত আদায় করেছে, তা মনে করতে পারে না’।[১৩]

উপরের হাদীছের প্রতি লক্ষ করুন, শয়তান আযান শুনতে পারে না। আযান শুনলে সে পলায়ন করে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে ঘর থেকে শয়তান তাড়ানোর উপায় হচ্ছে আযান দেওয়া। যদিও স্রেফ শয়তান তাড়ানোর জন্য আযান দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

(২) সূরা আল-বাক্বারা পাঠ করার মাধ্যমে: নবী ﷺ বলেন, لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ‘তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবর সদৃশ করে রেখো না। নিশ্চয় শয়তান যে ঘরে সূরা আল-বাক্বারা পাঠ করা হয়, সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায়’।[১৪]

কারো বদনযর অথবা যাদু লেগে গেলে কীভাবে তাকে সুস্থ করবেন?

আপনার বাচ্চা মাশা-আল্লাহ ভালো খায়, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কোনো বিরক্ত করে না। আপনার পাশের বাড়ির ভাবি এসে বলছে, আপনার বাচ্চা তো অনেক খায়! আমার বাচ্চা একেবারেই খায় না। অথবা আপনার পাশের বাড়ির ভাবি এসে বলছে, আপনার বাচ্চা তো অনেক সুন্দর, ফুটফুটে! এর পরদিন থেকে আপনার বাচ্চা আর আগের মতো খাওয়া-দাওয়া করে না অথবা আপনার বাচ্চার শরীরে ঘা হয়েছে অথবা চোখ-মুখ ফুলে গেছে অথবা অন্য কোনো রোগ হয়েছে! আমাদের সমাজে প্রায়শই এমন হয়ে থাকে। এমন হলে আপনার যদি সন্দেহ হয় যে, পাশের বাড়ির ভাবির এই কথা বলার কারণে এমন হয়েছে, তাহলে আপনি তাকে ডেকে এনে বলবেন, ভাবি! আপনি আমার বাচ্চার জন্য কষ্ট করে ওযূ করুন। মনে হচ্ছে আপনার নযর লেগেছে আমার বাচ্চার উপর। এই মুহূর্তে আপনার ভাবি কিন্তু রেগে যাবেন। তিনি বলবেন, না, না, আমার চোখ লাগেনি! ওই সময় আপনি তাকে বুঝিয়ে বলবেন, ভাবি! কারো চোখ লাগাটা

১০. ছহীহ মুসলিম, হা/২০৮৪।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩০৪।
১২. ফাতহুল বারী, হা/৩৩০৪।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৮।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৮০।

স্বাভাবিক। আমি যেহেতু আপনাকে সন্দেহ করছি, সেহেতু এখন আপনার ওযূ করে পানি দেওয়া ওয়াজিব। আপনি যদি ওযূ করে পানি না দেন, তাহলে গুনাহগার হবেন। তাই অবশ্যই আপনাকে ওযূর পানি দিতে হবে।

ওযূর পানি কীভাবে দিবেন?

বালতির মাঝে পানি নিয়ে ওই বালতিটা কোনো কিছুর উপরে রাখবেন। মাটিতে রাখা যাবে না। তারপর যে ব্যক্তির চোখ লেগেছে তথা পাশের বাড়ির ওই ভাবি বালতি থেকে এক আঁজলা পানি নিয়ে কুলি করে ওই কুলির পানি বালতিতে ফেলবে। তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করবে। তারপর বাম হাত দিয়ে পানি নিয়ে ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। এরপর ডান ও বাম হাতের কনুই ধৌত করবে। এরপর ডান ও বাম পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে। এরপর দুই পায়ের হাঁটু ধৌত করবে। তারপর লুঙ্গি বা পায়জামার নিচের অংশ তথা নাভির নিচে কোমর পর্যন্ত ধৌত করবে। তারপর ওই পানি ওই বাচ্চার পেছন দিক থেকে একবারে তার মাথায় ঢেলে দিবে। এভাবে পানি ঢেলে দিলে অবশ্যই বাচ্চা সুস্থ হয়ে যাবে, ইনশা-আল্লাহ!

আর আপনি যদি না জানেন আপনার বাচ্চাকে কার নযর লেগেছে; তাহলে এর চিকিৎসা হচ্ছে, ৭টি বরই পাতা শিল-পাটায় পিষে নিবেন। এরপর এক বালতি পানি নিয়ে সেগুলো পানিতে মিশিয়ে ওই পানিতে তিনবার করে সূরা আন-নাস, আল-ফালাক্ব ও আল-ইখলাছ পড়ে ফুঁক দিবেন। তারপর সাত বার সূরা আল-ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিবেন। তারপর আয়াতুল কুরসী পড়ে ফুঁক দিবেন। তারপর সূরা আল-বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পড়ে ফুঁক দিবেন। এভাবে ওই রোগীকে তিনদিন গোসল করাবেন। আপনার বাচ্চা সুস্থ হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ![১৫]

আপনি যদি মনে করেন, কেউ আপনাকে যাদু করেছে, তাহলে আপনি এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটা গ্রহণ করুন। উপরের পদ্ধতিটা হচ্ছে বদনযর এর ক্ষেত্রে। আর পরের পদ্ধতিটা হচ্ছে বদনযর ও যাদু উভয়টির ক্ষেত্রে।

যাদু ও বদনযর থেকে বাঁচার জন্য তাবীয ব্যবহার করার বিধান: যাদু ও বদনযর থেকে বাঁচার জন্য তাবীয ব্যবহার করা যাবে না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, একটি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলেই দাদি ও নানিরা বাচ্চার হাতে, পায়ে ও গলায় কত ধরনের তাবীয ঝুলায়! কোনো অবস্থাতেই তাবীয ঝুলানো যাবে না। নবী ﷺ বলেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ‘যে তামীমা (তাবীয) ঝুলায়, সে শিরক করে’।[১৬]

তাবীয ব্যবহার করলে কাজ হয় কেন?

তাবীয ব্যবহার করলে কাজ হয় কেন তা স্পষ্ট করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি আছার উল্লেখ করি। عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلاَنٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكِ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ‘যাদু, তাবীয ও অবৈধ প্রেম ঘটানোর মন্ত্র শিরক এর অন্তর্ভুক্ত’। তিনি (যায়নাব) বলেন, আমি বললাম, আপনি এসব কী বলেন? আল্লাহর কসম! আমার চোখ হতে পানি পড়ত, আমি অমুক ইয়াহূদী কর্তৃক ঝাড়ফুঁক করাতাম। সে আমাকে ঝাড়ফুঁক করলে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যেত। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এগুলো শয়তানের কাজ। সে নিজ হাতে চোখে যন্ত্রণা দেয়। যখন সে ঝাড়ফুঁক দেয়, তখন সে বিরত থাকে। এর চেয়ে বরং তোমার জন্য এরূপ বললেই যথেষ্ট হতো, যেরূপ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا. ‘হে মানব জাতির রব! যন্ত্রণা দূর করে দিন, আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদাতা, আপনার দেওয়া নিরাময়ই যথার্থ নিরাময়, যার পরে আর কোনো রোগ বাকি থাকে না’।[১৭]

এই আছারের প্রতি আপনি লক্ষ করলে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে, শয়তান মূলত মানুষকে ভয়-ভীতি দেখায়। যখন মানুষ তাবীয ঝুলায়, তখন শয়তান চলে যায়। কারণ শয়তানের কাজ হচ্ছে মানুষকে বিপথগামী করা, জাহান্নামী করা। যখন মানুষ তাবীয ব্যবহার করে, তখন সে শিরক করে। এর কারণে শয়তান তার থেকে চলে যায়।

যাদুর পরিবর্তে যাদু করার বিধান: কেউ যদি আপনাকে যাদু করে, তাহলে এই যাদু ছুটানোর জন্য যাদু করা যাবে না। কেননা যাদু করা কুফরী। বরং আপনাকে বৈধ ঝাড়ফুঁক করতে হবে। আল-হামদুলিল্লাহ! বর্তমানে ছহীহ আক্বীদার অনেক আলেম আছেন, যারা ঝাড়ফুঁক করেন। আপনি তাদের কাছে যান। আশা করা যায় সুস্থ হয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যাদু ও বদনযরের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

১৫. ফাতহুল বারী, হা/৫৭৬৫, ১৩/১৮৩।

১৬. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৪২২।

১৭. আবূ দাঊদ, হা/৩৮৮৩।

আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ: এসো! আল্লাহর পথে...

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৩)

ইবাদতের যোগ্য হওয়ার জন্য প্রতিপালক হওয়ার চ্যালেঞ্জ:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ - أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: হে মানুষ! তুমি কি চিন্তা কর না, কে এত উঁচু আকাশ আর এত সুবিন্যস্ত বসবাস উপযোগী পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? কে আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরান? সেই বৃষ্টির মাধ্যমে কে উৎপাদন করেন দৃষ্টিনন্দন বাগান? এই সমস্ত বৃক্ষরাজির একটি দানাও তো তোমাদের পক্ষে অঙ্কুরোদগম করা সম্ভব নয়? তবুও কি তোমরা মনে কর, আল্লাহর সঙ্গে আর কোনো উপাস্য থাকতে পারে? আসলে যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে, তারা মূলত আল্লাহর সাথে অন্যায় করে। আল্লাহর হক্ব নষ্ট করে।

হে মানুষ! আরও চিন্তা করো! কে পৃথিবীকে কোনো দড়ি, কংক্রিটের পিলার, লোহার জিঞ্জির কোনোকিছু ছাড়াই এমনভাবে শূন্যে স্থির করে রেখেছেন যে, মহাবিশ্বের ক্ষতিকর কোনো আলো ও বস্তু এখানে এসে পৌঁছাতে পারে না এবং এটিও শূন্যে ঘূর্ণায়মান থাকা অবস্থায় অন্য কোনো গ্রহের সাথে ধাক্কা খায় না। এই পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করার জন্য তার বুক চিরে প্রবাহিত করেছেন সুমিষ্ট পানির নদী-নালা, অথচ মহাবিশ্বের অন্য কোনো গ্রহে বসবাস উপযোগী পানি ও অক্সিজেন নেই। পৃথিবীর ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য পৃথিবীর গভীর থেকে স্থাপন করেছেন মজবুত উঁচু উঁচু পাহাড় আর পাশাপাশি প্রবহমান দুই সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন যে, একটির লবণাক্ত পানি আরেকটির সুমিষ্ট পানির সাথে মিশে যায় না।

এখন তুমি চিন্তা করে দেখো! পৃথিবীতে যত মিথ্যা ইলাহের ইবাদত বা পূজা করা হয়, তারা কি কেউ এই কাজগুলো করার যোগ্যতা রাখে? যদি না রাখে, তাহলে তুমিই বলো! আল্লাহ ব্যতীত আর কে একনিষ্ঠ ভক্তি ও আনুগত্য পাওয়ার যোগ্যতা রাখে? আসলে যারা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কোনো ভ্রান্ত ইলাহেরও ইবাদত করে, তাদের অনেকেই সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ *(আন-নামল, ২৭/৬০-৬১)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ - وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা যে ভ্রান্ত ইলাহগুলোকে এত শ্রদ্ধা কর, তাদের সামনে মাথা নত কর, বিপদে-আপদে তাদের কাছে দৌড়ে যাও, তাদের কাছে সাহায্য চাও; একবারও কি চিন্তা করে দেখেছ তাদের একজনও কি এই বিশাল আসমান ও যমীনের একটি কণারও মালিকানা দাবি করতে পারবে? পূর্ণ মালিকানার কথা বাদ দিলাম, আংশিক মালিকানারই দাবি করতে পারবে কি? এই সমগ্র মহাবিশ্বের এক বিন্দু পরিমাণেরও তারা আংশিক মালিক হওয়া তো দূরের কথা এই আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে তাদের কোনো সহযোগিতাও নেই। তারা এমন কেউ নয়, যাদেরকে আল্লাহ এসে বলবেন যে, এসো আমাকে সাহায্য করো। তাহলে তাদের অবস্থান কী? এই সমস্ত ভ্রান্ত ইলাহগুলো নির্বাক, নির্জীব ও অসহায়। তাদের একমাত্র পরিচয় তারা আল্লাহর সৃষ্টিজীব।

এবার যদি তুমি বলো, ঠিক আছে! তারা কোনো কিছুর মালিক না হলেও তারা আল্লাহর এত প্রিয় যে, তারা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে; তাহলে তোমাদের সদয় অবগতির জন্য বলি, ভালো করে জেনে রাখো! প্রথমত, মহান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছে সুপারিশ করার সাহস বা তাঁর সাথে কথা বলার কোনো ক্ষমতা রাখে না। দ্বিতীয়ত, ফেরেশতাদের মতো নূরের তৈরি মহান আল্লাহর এত কাছে থাকা সৃষ্টিজীবেরাও আল্লাহর সাথে কথা বলতে গিয়ে এতটা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যে, তারা আল্লাহর কথা শুনে ভয়ে-আতঙ্কে পাখা ছটফট করতে থাকে। তাদের পাখার ছটফটানির আওয়াজে আল্লাহর নিকটস্থ ফেরেশতা ছাড়া অন্যরা কথা শুনতে পায় না। তখন তারা আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে জানার জন্য আল্লাহর নিকটস্থ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করে মহান আল্লাহ কী আদেশ দিলেন? তখন নিকটস্থ ফেরেশতারা বলে, তিনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন আর তিনি সবার চেয়ে বড়, মহান ও উঁচু। এই যদি হয় ফেরেশতাদের অবস্থা, তাহলে কল্পনা করো তোমাদের সেই সমস্ত ইলাহের মিথ্যুক দাবিদারদের কী অবস্থা হবে? *(সাবা, ৩৪/২২-২৩)*।

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: আকাশে কত নামকরা ফেরেশতা আছেন, কিন্তু তাদের কোনো শাফাআত বা মধ্যস্থতা কাজে দেয় না, যদি না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অনুমতি দেন এবং যাকে তিনি পছন্দ করেন *(আন-নাজম, ৫৩/২৬)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ - وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: এই আয়াতের পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নেয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, তিনি কীভাবে মানুষের জন্য পশু-প্রাণি থেকে দুধের ব্যবস্থা করেছেন, কীভাবে একই শরীরে রক্ত, দুধ ও বর্জ্য বা গোবর আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। গরুর একটি থানে প্রতিদিন ৪০০–৫০০ লিটার রক্ত প্রবাহিত হয় দুধ তৈরির জন্য! কিন্তু সেই রক্ত এক ফোঁটাও দুধে মিশে না। চতুষ্পদ জন্তুর দুধে প্রোটিন, মিনারেল ও ফ্যাটের মতো প্রায় ২০০টি উপাদান থাকে, যা পৃথিবীর কোনো ল্যাব এখন পর্যন্ত তৈরি করতে পারেনি। ঠিক এভাবেই মহান আল্লাহ মানুষের জন্য মৌমাছির মাধ্যমে হাজারো ফুল থেকে মধুর ব্যবস্থা করেছেন, যে মধুতে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিসেপটিক গুণ, যা সদা সতেজ থাকে এবং নষ্ট হয় না। প্রাচীন মিসরের ৩০০০ বছর পুরোনো মধু বর্তমানে পাওয়া গেছে খাবার উপযোগী অবস্থায়! এক চামচ মধু সংগ্রহ করতে ১২টি মৌমাছিকে প্রায় ৪০০০ ফুল ভিজিট করতে হয়!

এই সমস্ত নেয়ামত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মহান আল্লাহ স্ত্রী-পুত্র, সন্তানসন্ততির নেয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন। মানুষের আত্মিক প্রশান্তির সবচেয়ে বড় জায়গা তার পরিবার। পরিবারে শান্তি থাকলে সে দুনিয়াতেই জান্নাতের স্বাদ পেয়ে যায়। পরিবারের শান্তি পৃথিবীর কোনো প্রযুক্তি মানুষকে দিতে অক্ষম। এত কিছুর পরও মানুষ কীভাবে আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করতে পারে আর ত্বাগূতের অনুসরণ করতে পারে? অথচ আল্লাহ ব্যতীত তাদের যারা ইবাদত করে, তারা আসমান ও যমীন থেকে এক ফোঁটা রিযিক্বের ব্যবস্থাও তাদের জন্য করতে পারবে না। জি, এক ফোঁটা দুধ বা এক ফোঁটা মধুও মানুষের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। তাদের অক্ষমতাই প্রমাণ করে যে, তারা ইবাদতের যোগ্য নয় *(আন-নাহল, ১৬/৭২-৭৩)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا - لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا - تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا - أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا - وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا - إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: যারা পৃথিবীতে বিভিন্ন বাতিল ইলাহ বানিয়েছে এবং সেগুলোকে বিভিন্নভাবে মহান আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম একটি উদাহরণ হচ্ছে, খ্রিষ্টানদের ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর সন্তান দাবি করার বিষয়টি। মহাশক্তিশালী মহাপবিত্র মহান আল্লাহর সম্মান, মর্যাদা ও পবিত্রতার শানে সন্তান দাবি করার বিষয়টি এতটা ভয়ানক ও গর্হিত এবং এই কথার জঘন্যতার ওযন এত ভারী যে, যদি তা আসমান ও যমীনের উপর নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে এই কথার জঘন্যতা সহ্য করতে না পেরে এত বিশাল আসমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে আর এত বিশাল পৃথিবী ফেটে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ সন্তান, পিতা, ঘুম, খাবার ও বিশ্রামসহ মানুষের মতো সকল দুর্বলতা থেকে পবিত্র। আর সন্তানের মুখাপেক্ষী হওয়া তো বহু দূরের কথা; এই আসমান-যমীন ও তার মঝে যত সৃষ্টিজীব আছে, সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, যত মহৎ ও সম্মানিতই হোক না কেন, অভিশপ্ত ইবলীস থেকে শুরু করে মহা সম্মানিত ফেরেশতা পর্যন্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আলাইহিস সালাম-সহ অন্যান্য সকল নবী, অলী-আউলিয়া, ছিদ্দীক্ব-শুহাদা যেই হোক না কেন, তাদের সবার সাথে মহান আল্লাহর একমাত্র সম্পর্ক হলো তারা মহান আল্লাহর সৃষ্টিজীব ও দাস আর মহান আল্লাহ তাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু *(মারইয়াম, ১৯/৮৮-৯৩)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের সাধু, পণ্ডিত ও মারইয়াম (আ.)-এর ছেলে ঈসা আলাইহিস সালাম-কে তাদের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। অথচ স্বয়ং ঈসা ও মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম সারাজীবন মহান আল্লাহর ইবাদত করেছেন এবং মানুষকে এটাই বুঝিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো সত্তা পৃথিবীতে নেই। আর এই কাজের জন্যই তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং মহান আল্লাহ মানুষের শিরক থেকে পবিত্র *(আত-তাওবা, ৯/৩১)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ

وَكِيلًا - لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: হে তাওরাত ও ইনজীল (বুক অব গসপেল)-এর অনুসারীরা! তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহর নামে মিথ্যা বলো না। বরং জেনে রাখো! মারইয়াম (আ.)-এর ছেলে ঈসা আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর প্রেরিত রাসূল আর মহান আল্লাহ তাকে 'কুন' এই শব্দ দিয়ে তৈরি করেছেন। আর আল্লাহ কোনো কিছু করতে চাইলে তিনি 'হও' বললেই তা সাথে সাথে হয়ে যায়। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে মারইয়াম (আ.)-এর পেটে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ ইতঃপূর্বে পিতা ও মাতা ছাড়া আদম আলাইহিস সালাম-কে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন এবং মাতা ছাড়া হাওয়া (আ.)-কে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। সেই তুলনায় তো শুধু পিতা ছাড়া ঈসা আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করা অসম্ভব কিছু নয়। অতএব, তোমরা এই দাবি করা ছেড়ে দাও যে, আল্লাহ ঈসা ও মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম মিলে এক সত্তা, নাউযুবিল্লাহ! এর মধ্যেই তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে। জেনে রাখো! ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সত্তা মহান আল্লাহ। আসমান-যমীন ও তার মাঝে যা কিছু আছে, তার সকল কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছেন তিনি। তার সন্তান থাকা তো বহু দূরের কথা, বরং তাঁর শুধু গোলাম ও দাস আছে। ঈসা ও মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম ও তাঁর দাস। শুধু তাই নয়, তারা নিজেরা দুজন এবং মহান আল্লাহর নিকটস্থ ফেরেশতারা পর্যন্ত তাঁর নৈকট্য অর্জন করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাঁর ইবাদত করতে ব্যস্ত থাকে। তারা কখনোই অহংকারী হয়নি আর আসমান ও যমীনে কেউ যদি অহংকারবশত আল্লাহর ইবাদত না করে, তাহলে সে দেখবে কীভাবে আল্লাহ তাদের সকলকেই ক্বিয়ামতের মাঠে একত্রিত করবেন। সেদিন তাদের আর করার কিছু থাকবে না। আর মহান আল্লাহ সকল দুর্বলতা থেকে পবিত্র এবং দায়িত্বশীল হিসেবে তিনি একাই যথেষ্ট *(আন-নিসা, ৪/১৭১-১৭২)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: পৃথিবীতে যত বাতিল ইলাহ আছে, তাদের ভ্রান্তি স্পষ্ট করতে গিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার কারাগারের দুই সহবন্দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের কী মনে হয় মহাশক্তিশালী ও মহাপ্রতাপশালী একক সত্তা বেশি ইলাহ হওয়ার যোগ্য, না ভাগাভাগি করে কয়েকজন মিলে ইলাহ হওয়া বেশি ভালো? যদি ভাগাভাগি করে কয়েকজন মিলে ইলাহ হয়, তাহলে একদিনও তারা পৃথিবী চালাতে পারবে না, পরস্পরে মারামারি লেগে যাবে। যেমন পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে অসংখ্য দেশ ও অসংখ্য শাসক থাকায় তাদের স্বার্থ ভিন্ন হয় এবং যুদ্ধ ও মারামারি লেগেই থাকে। আসলে তোমরা যে ভ্রান্ত ইলাহগুলোর পূজা কর, এগুলোর বাস্তবে না কোনো অস্তিত্ব আছে, না তাদের জন্য প্রকৃত ইলাহ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দলীল-প্রমাণ আছে। এগুলো সব তোমাদের নিজেদের অথবা তোমাদের বাপ-দাদাদের মনগড়া বানানো ইলাহ। আর জেনে রাখো! আসমান-যমীনে একমাত্র মহান আল্লাহর একচ্ছত্র শাসন ও আধিপত্য চলে আর তিনিই তোমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত বা দাসত্ব করা যাবে না আর এটিই সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায় ও সত্যের সহজ-সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ হওয়ার কারণে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদতের যোগ্য মনে করে থাকে *(ইউসুফ, ১২/৩৯-৪০)*।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহের সারমর্ম:

আল্লাহ-ই আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা। আমাদের সকলের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করা সব তিনিই করেছেন। রাত-দিনের আবর্তন, সূর্য-চন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে। এক কথায় আসমান ও যমীনের সকল সিস্টেম তাঁর নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদের ইবাদত করা হয়, তারা নিজেই আল্লাহর সৃষ্টিজীব। তারা নিজেরা একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না। একটা গাছও উৎপাদন করতে পারে না। তারা কেউ খেজুরের বিচির পাতলা আবরণ পরিমাণ তথা অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয়। যাদের ডাকা হয়, তারা কিছুই শুনে না, সাড়া দেয় না; বরং উল্টো ক্বিয়ামতের দিন যারা তাদের পূজা করত, সেই সমস্ত অনুসারীদের থেকে তারা নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করবে। এটা অজ্ঞ অনুসারীদের জন্য চরম অপমানজনক হবে।

যত বড় নবীই হোক না কেন, যত বড় অলী-আউলিয়া হোক না কেন, তার একমাত্র পরিচয় সে আল্লাহর দাস। ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকে এককভাবে আল্লাহর সামনে আল্লাহর দাস হিসেবে হাযির হবে আর তাদের কারো আল্লাহর কাছে মধ্যস্থতা বা শাফাআত করার ক্ষমতা নেই, যতক্ষণ না আল্লাহ অনুমতি দেন। এমনকি আল্লাহর নিকটস্থ নামকরা ফেরেশতাদেরও সেই ক্ষমতা নেই, বরং তারাও সবসময় আল্লাহর ভয়ে তটস্থ থাকে। শুধু তাই নয়, তারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য পেতে ব্যাকুল হয়ে থাকে এবং আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকে। তাদের ইবাদত করতে হবে এই মর্মে পূর্ববর্তী কোনো কিতাবে কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। সম্পূর্ণ দলীলবিহীন ও অযৌক্তিকভাবে তাদের পূজা করা হয়।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

উকিল বাবা কালচার

-মুহাম্মাদ সিরাজ উদ্দীন*

আমাদের সমাজ ও দেশে অসংখ্য সামাজিক কুপ্রথা ও ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার বিদ্যমান। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে— ‘উকিল বাবা’ কালচার। এটি আমাদের সমাজে খুবই প্রচলিত ও পরিচিত একটি কালচার, যা হিন্দু সমাজ থেকে আমাদের সমাজে অযাচিতভাবে আগত। দীর্ঘদিন আমরা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করার ফলে হিন্দুদের এরকম অনেক ধর্মীয় ও সামাজিক কৃষ্টি-কালচার আমাদের মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। একেকটি কালচার মুসলিম সমাজে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে বসে আছে, যা আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমদের ধর্মীয় কালচার বলেই মনে হয়।

‘উকিল বাবা’ বলতে বুঝায় বিয়ের সময় কনের বাবার পক্ষ থেকে নিযুক্ত মেয়ের অভিভাবক, যাকে বিয়ের পর নিজের বাবার মতো মনে করে দম্পতি। বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে বিবাহিত দম্পতি ‘উকিল বাবা’ নামক নতুন সৃষ্ট এই বাবাকে দাওয়াত দিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসাতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন, ভালোমন্দ খাবার খাওয়ান, আদর-আপ্যায়ন করেন, বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। অপরপক্ষে মেয়ে-জামাইও বিভিন্ন সময়ে উকিল বাবার আমন্ত্রণে তার বাড়িতে যাতায়াত করেন। এভাবে দুপক্ষের সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়। ফলে অবাধে-অনায়াসে দুপক্ষের যাতায়াতের মাধ্যমে নতুন এক সম্পর্কের সূত্র ধরে বেগানা নারী-পুরুষের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়, যা ইসলাম কোনোভাবেই সমর্থন করে না। আর এই সম্পর্কের সূত্র ধরে উকিল বাবা ও মেয়ের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার পথ সুগম হয়। সমাজে যার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

উকিল বাবাকে বাবা বলে ডাকা, তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা পরিষ্কার হারাম। কারণ কুরআন ও হাদীছে এ পরিভাষাটির কোনো অস্তিত্ব নেই, যার প্রমাণ হাদীছে এসেছে। সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ‘যে ব্যক্তি জেনেশুনে নিজের পিতাকে ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে দাবি করে, তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে’।[১]

মেয়ের বিয়েতে জন্মদাতা পিতাই মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করবেন অর্থাৎ উকিল হবেন। এক্ষেত্রে অন্য কারো উকিল হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মেয়ের পিতার অবর্তমানে মেয়ের চাচা, মামা, ভাই বা অন্য কোনো পুরুষ মেয়ের উকিল হতে পারবেন। এটিই শরীআত সমর্থিত পদ্ধতি। কিন্তু তা না করে আমাদের সমাজে করা হয় এর উল্টোটা।

অর্থাৎ মেয়ের পিতার উপস্থিতিতে অন্য একজন পুরুষকে মেয়ের উকিল নিযুক্ত করা হয়। বিয়েতে এ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপেই একটি ভুল পদ্ধতি, একটি সামাজিক কুসংস্কার। যে কুসংস্কারটি আমাদের সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজের বর্তমান অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কী শিক্ষিত, কী মূর্খ সবাই এই নিয়ম পালনে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সামাজিক এই কুপ্রথা বা ব্যাধি নিরসনে কারো কোনো জোরালো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় না। অনেকে বিষয়টি হারাম জেনেও মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, সমাজের সিংহভাগ মানুষই বিয়ে-শাদীর মতো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলোর ইসলামী সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। তাই তারা প্রচলিত পদ্ধতিকেই সঠিক বলে মনে করেন ও সে অনুযায়ী কাজ করেন। ফলে সমাজে সঠিক ইসলামী বিবাহের রূপরেখা তুলে ধরলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। মানুষকে ছহীহ সুন্নাহর কথা বুঝিয়ে বলা কঠিন হয়ে পড়ে।

আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, ‘ওলী ছাড়া বিয়ে হয় না’।[২] অর্থাৎ মেয়ের পিতার বর্তমানে তাকে ছাড়া বিবাহ বৈধ হয় না। অথচ সমাজে তা দেদারসে চলছে বৈকি! সম্পূর্ণ বিপরীত এক কর্মকাণ্ড। আর ওলী ছাড়া সমাজে বিবাহ হওয়ার সুযোগ থাকায় ছেলে-মেয়েরা অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে গোপনে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করছে। অভিভাবকরা কষ্ট করে সন্তান লালনপালন করেও তার বিয়ে দিতে পারছে না। সন্তান তার খেয়ালখুশি মতো কাউকে পছন্দ করে তার হাত ধরে চলে যাচ্ছে, বিয়ে করছে। এভাবে সমাজে নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক, যেনা-ব্যভিচার ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। পিতার জীবদ্দশায় পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে নিজে নিজে তার বিয়ে বাস্তবায়ন করার অধিকার ইসলাম কোনো মেয়েকে দেয়নি।

প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৯ নং পৃষ্ঠায়

* শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৩২৬।

২. আবূ দাঊদ, হা/২০৮৫; তিরমিযী, হা/১১০১।

প্রকৃত ঈমানদারদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা ও কর্তৃত্ব

[১৭ যুলহিজ্জাহ, ১৪৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৩ জুন, ২০২৫ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ড. ইয়াসির আদ-দূসারী*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি মহান অনুগ্রহশীল। তিনি তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ করেছেন এবং অনুগত বান্দাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি ঈমানদারদের প্রতি ছিলেন স্নেহপরায়ণ ও দয়াশীল। আল্লাহ তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন আর তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হোক, যারা তাঁর পথ অনুসরণ করে চলে এবং সোজা ও সরল পথের উপর অটল থাকে।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় করে চলুন। আর জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন আর যে ব্যক্তি তাঁর শারঈ সীমারেখাকে রক্ষা করে, আল্লাহও তাকে রক্ষা ও লালনপালন করেন। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ﴾ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে আছেন, যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎ কর্মপরায়ণ' *(আন-নাহল, ১৬/১২৮)*।

হে ঈমানদারগণ! ইবাদতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি মৌসুম অতিবাহিত হয়ে গেছে। শেষ হয়েছে হজ্জ ও আরাফাতের দিনসমূহ। রহমানের অতিথি হিসেবে পবিত্র হারামে প্রবেশে আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন! আপনারা আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এবং পবিত্র বিষয়সমূহ ও ইসলামের নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

আর আপনারা হজ্জের সময়ে পবিত্র স্থানসমূহ তাওহীদের স্লোগানে মুখরিত করে তুলেছিলেন। আপনাদের পরিপূর্ণভাবে হজ্জ পালনের জন্য এবং মহান আল্লাহ আপনাদেরকে যে অনুগ্রহ ও নেয়ামত দিয়েছেন তার জন্য অভিনন্দন! মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ 'বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়। এটা যা তারা জমা করে, তা থেকে উত্তম' *(ইউনুস, ১০/৫৮)*।

জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয় ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম নিদর্শন হলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আমলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং এই কল্যাণের ধারা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া। আর মানুষকে দৃঢ় রাখে এবং ইবাদতে অবিচল রাখে এমন বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো সর্বক্ষেত্রে বান্দা তার রবকে (বিধিনিষেধ মানার মাধ্যমে) হেফাযত করবে, যাতে সে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে আল্লাহর নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, কোনো এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ছিলাম। তিনি ﷺ বললেন,

يَا غُلاَمُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

'হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, তুমি মহান আল্লাহর (বিধিনিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখবে, আল্লাহ তাআলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলার নিকট চাও আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ তাআলার নিকটেই করো। আর জেনে রাখো! যদি পুরো জাতিও তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকার-ই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপরদিকে তারা ততটুকুই ক্ষতি করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে'।[১] অতএব, এই হাদীছটি ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ ও মহান হেদায়াতসমূহের বাহক।

এখানে নবী ﷺ উক্ত হাদীছটি শুরু করেছেন এই বলে যে,

১. তিরমিযী, হা/২৫১৬, হাদীছ ছহীহ।

‘হে ছেলে! আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিব’ অর্থাৎ এমন কিছু কথা, যেগুলো আল্লাহ তোমার পার্থিব ও আখেরাতের জীবনে উপকার বয়ে আনবে। আর এতে রয়েছে বক্তব্যের এক অনন্য সূচনাকৌশল, যা শ্রোতাকে মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং বলা কথার প্রতি মনোযোগী করে তোলে। এরপর তিনি ﷺ বললেন, ‘তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহ তোমার হেফাযত করবেন’ অর্থাৎ তুমি খুব দৃঢ়তার সাথে তাঁর হক্ব ও বিধিবিধানের সীমারেখাকে হেফাযত করবে, তাঁর আদেশ মান্য করবে এবং নিষেধ এড়িয়ে চলবে। যে ব্যক্তি এভাবে আল্লাহর বিধিবিধানের সীমারেখাকে রক্ষা করে চলে, সে রহমান এর সীমারেখা হেফাযতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুত জান্নাতের অধিকারী হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘(তাদের বলা হবে) এ হলো তাই, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী ও (গুনাহ থেকে) খুব বেশি হেফাযতকারীর জন্য। যে না দেখেই দয়াময় (আল্লাহকে) ভয় করত আর আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য বিনয়ে অবনত অন্তর নিয়ে উপস্থিত হতো। (তাদেরকে আরও বলা হবে) শান্তির সঙ্গে এতে প্রবেশ করো, এটা চিরস্থায়ী জীবনের দিন’ *(ক্বাফ, ৫০/৩২-৩৪)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহর সীমারেখা ও অধিকারসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাওহীদের বাস্তবায়ন এবং তাওহীদকে সকল প্রকার শিরক ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে পরিশুদ্ধ রাখা। তাওহীদই হলো দ্বীনের মূলভিত্তি ও তার স্তম্ভ। তাই তাওহীদ বিবর্জিত কোনো আমলের প্রতিদান আশা করা যায় না। তাওহীদের সাথে সঠিকভাবে কোনো আমল বাস্তবায়িত হলেই কেবল তা কবুলের আশা করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ - بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

‘আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন; তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। বরং আপনি আল্লাহর-ই ইবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন’ *(আয-যুমার, ৩৯/৬৫-৬৬)*।

আর তাওহীদ বাস্তবায়নের পর বান্দার ওপর যেসব বিষয়ের হেফাযত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে অন্যতম হলো ছালাতের হেফাযত করা। কেননা ছালাত হলো ইসলামের মূল স্তম্ভ এবং সর্বপ্রথম মানুষের কাছে এই ছালাতেরই হিসাব চাওয়া হবে। এটি হলো সফলতা লাভের রহস্য এবং মুক্তির চাবিকাঠি। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ‘তোমরা ছালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও’ *(আল-বাকারা, ২/২৩৮)*।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনাদের উচিত ইসলামের সকল স্তম্ভগুলোর যথাযথ হেফাযত করা। যেমন- যাকাত, হজ্জ ও ছওম। সুতরাং এসব ইবাদতের প্রতি পূর্ণ যত্নবান হোন এবং এগুলোর হক্ব সর্বোত্তমভাবে আদায় করুন।

হে ঈমানদার ভ্রাতৃমণ্ডলী! উক্ত হাদীছে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, ‘আল্লাহ তোমার হেফাযত করবেন’ এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার দ্বীন ও দুনিয়ার হেফাযত করবেন। কেননা বান্দার প্রতিদান নির্ধারিত হয় তার কর্ম অনুযায়ী। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ ‘আর তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করো, তাহলে আমি তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব’ *(আল-বাক্বারা, ২/৪০)*।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য হেফাযত দুভাবে হতে পারে। প্রথমত, আল্লাহ বান্দাকে তার দ্বীন, ঈমান এবং নবী ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণের ব্যাপারে হেফাযত করেন। এটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। তা হলো মহান আল্লাহ বান্দাকে তার জীবদ্দশায় বিভ্রান্তিকর সন্দেহ থেকে রক্ষা করেন, হারাম আকাঙ্ক্ষা থেকে বাঁচান এবং এমন সব বিষয় থেকে দূরে রাখেন, যা তার দ্বীনকে নষ্ট করতে পারে। আর মৃত্যুর সময়েও তাকে হেফাযত করেন, যাতে সে ঈমান ও সুন্নাহর ওপর মৃত্যুবরণ করে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ বান্দাকে তার দুনিয়াবী কল্যাণকর কাজের ব্যাপারে হেফাযত করেন। যেমন- সে নিজে, তার সন্তানসন্ততি, পরিবার-পরিজন এবং সম্পদ হেফাযতে থাকা। ফলে কোনো ক্ষতি তার কাছে পৌঁছাতে পারে না এবং কোনো কষ্টদায়ক বিষয় তাকে স্পর্শ করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ ‘মানুষের সামনে ও পেছনে পাহারাদার নিযুক্ত আছে, যারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে’ *(আর-রা'দ, ১৩/১১)*। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ একজন নেককার ব্যক্তির কারণে তার সন্তান, তার সন্তানের সন্তান, এমনকি তার চলার পথের আশপাশের ঘরগুলো পর্যন্ত হেফাযত করেন। ফলে তারা সবাই আল্লাহর হেফাযত ও তাঁর নিবিড় আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। মূলত বান্দা তার রবের বিধিবিধানের প্রতি যতটুকু হেফাযতের মনোভাব রাখে, আল্লাহও তাকে ততটুকুই হেফাযত করেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, ‘তুমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তাহলে তুমি আল্লাহ তাআলাকে কাছে পাবে’। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে, তাঁর অধিকারসমূহের প্রতি যত্নবান হয়, সে সকল অবস্থায় আল্লাহকে সঙ্গে পায়। আল্লাহ তাকে ঘিরে রাখেন, তাকে সাহায্য করেন, সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তাকে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ় রাখেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ﴾ ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল’ *(আন-নাহল, ১৬/১২৮)*।

হে মানবমণ্ডলী! উক্ত হাদীছে বর্ণিত নবী ﷺ-এর বাণী, ‘তোমার কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলার নিকট চাও আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ তাআলার নিকটেই করো’। এটা ঠিক তেমনি, যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ‘আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই’ *(আল-ফাতিহা, ১/৫)*। এখানে আল্লাহর কাছে চাওয়ার অর্থ হলো, তাঁর নিকট দু‘আ করা ও তাঁর কাছে গভীর আকাঙ্ক্ষা রাখা। সুতরাং কিছু চাইতে হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাওয়া আবশ্যক এবং একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া উচিত। কারণ কল্যাণ পৌঁছানো এবং অকল্যাণ দূর করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে, যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

بارَك اللهُ لي ولكم في القرآن والسُّنَّة، ونفعني وإيَّاكم بما فيهما من الآيات والحكمة.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর এবং তাঁর পরিবার, ছাহাবী ও যারা তাদের অনুসরণ করেছে তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর, হে মুসলিমগণ! উক্ত মর্যাদাপূর্ণ হাদীছের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘আর জেনে রাখো! যদি পুরো জাতিও তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকার-ই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপরদিকে তারা ততটুকুই ক্ষতি করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে’—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বান্দার জীবনে উপকার বা ক্ষতি যা আসে, তা সবই আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ‘বলুন, আমাদের জন্য আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু ঘটবে না; তিনি আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত’ *(আত-তাওবা, ৯/৫১)*। তাই বলা যায়, তাক্বদীরের সকল বিষয়সমূহ ইতোমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং তা লেখা হয়েছে আল্লাহর আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার আগেই। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা সকল মাখলূকের তাক্বদীর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে লিখে রেখেছেন’।[২]

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ আপনাদের ওপর দয়া করুন। যে ব্যক্তি সুখ-সমৃদ্ধির সময়ে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থাকে, আল্লাহও তার সঙ্গে থাকেন এবং সকল অবস্থায় তার হেফাযত করেন। আর কঠিন বিপদ ও সংকটপূর্ণ সময়ে তাকে রক্ষা করেন এবং সকল বিপদ থেকে নিরাপদ রাখেন।

হে আল্লাহর পবিত্র ঘরের হাজীগণ! আল্লাহ আপনাদের হজ্জ ও সাঈ কবুল করুন। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের জন্য এ বরকতময় মৌসুমগুলো বহু বছর ধরে বারবার ফিরে আসার তাওফীক্ব দিন।

হে আল্লাহ! বিপদগ্রস্তদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিন, কষ্টে থাকা লোকদের কষ্ট লাঘব করে দিন, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিন, আমাদেরকে ও সমস্ত মুসলিমকে রোগ থেকে আরোগ্য দিন। হে আল্লাহ! আমাদের মৃত ও সমস্ত মুসলিমদের মধ্যে মৃতদের প্রতি দয়া করুন।

হে আল্লাহ! আপনি ফিলিস্তীনের নির্যাতিত মুসলিম ভাইদের সাহায্য করুন; ফিলিস্তীনসহ পৃথিবীর প্রতিটি স্থানের নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিন, প্রতিটি সংকট থেকে নিস্তার দিন এবং প্রতিটি বিপদ থেকে নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ! তাদের আহতদের আরোগ্য দিন, তাদের রক্তপাত থামিয়ে দিন এবং তাদের হৃদয়কে দৃঢ় ও ধৈর্যশীল করুন।

হে আল্লাহ! আপনি মসজিদে আক্বছাকে হেফাযত করুন এবং তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ রাখুন।

হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আল্লাহ! আমাদের তওবা কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৩।

রাগ প্রশমনের নববী পদ্ধতি

-হাসান আল-বান্না মাদানী*

রাগ আল্লাহ তাআলার জন্য যদি না হয়, তাহলে তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। ক্রোধ কত রকম ক্ষতি করতে পারে, তা যদি সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হবে। মানুষ ক্রোধের বশে বড় বড় অপরাধ, নানা ধরনের অনাচার এবং এমন এমন কাজ করে বসে, যার কারণে পরক্ষণে সে নিজেই অনুতপ্ত হয়। এসব কিছু লক্ষ করলে খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, রাগ মানুষের জন্য কতটা ক্ষতিকর!

রাসূল ﷺ রাগের সময় কীভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, তা আমাদের জন্য একটি অনুকরণীয় আদর্শ। রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময়ে বহু মানুষের থেকে কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু তিনি রাগান্বিত না হয়ে সর্বদা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং উম্মতকেও এই শিক্ষাই দিয়েছেন।

রাগের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ:

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের পর রাসূল ﷺ গনীমতের মাল বণ্টন করলেন এবং বণ্টনে তিনি কিছু মানুষকে প্রাধান্য দিলেন। যেমন- আক্বরা ইবনে হাবেস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ১০০টি উট দিলেন এবং উয়াইনা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কেও ১০০টি উট দিলেন। এমনিভাবে আরও কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দান করলেন। এ দৃশ্য দেখে একজন বলতে লাগল, আল্লাহর শপথ! এই বণ্টনে ন্যায়-নীতি অনুসরণ করা হয়নি। বণ্টনের সময় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির কথা চিন্তা করা হয়নি। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথা সহ্য করতে পারলেন না। তাকে বললেন, তুমি রাসূল ﷺ সম্পর্কে এমন মন্তব্য কর! আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমার এ কথা রাসূল ﷺ-কে জানাব। রাসূল ﷺ-কে জানানো হলে তিনি বিন্দু পরিমাণ রাগান্বিত না হয়ে কেবল এতটুকুই বললেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যদি ন্যায় প্রতিষ্ঠা না করেন, তাহলে কে এমন আছে যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে?' তিনি মূসা আলাইহিস সালাম-এর কথা স্মরণ করলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর রহম করুন। নিশ্চয়ই তাঁকে এর চাইতেও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। এরপরেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন'।[১]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল ﷺ-এর এক দাওয়াতী সফরের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, রাসূল ﷺ ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তায়েফে গিয়েছিলেন।[২] সাড়া না পেয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ফিরে আসছিলেন। পথে জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনার এই কঠিন অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছেন। আপনি আপনার জাতির ব্যাপারে যা আদেশ করবেন, পাহাড়ের ফেরেশতা তা পালন করবেন। এরপর পাহাড়ের ফেরেশতা রাসূল ﷺ-কে ডেকে বললেন, আপনি আপনার জাতির ব্যাপারে যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, আমরা সেটি পালন করতে প্রস্তুত। আপনি চাইলে পাহাড় চাপা দিয়ে তাদের ধ্বংস করে দেব।

রাসূল ﷺ জাতির কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইলেন না। তিনি বললেন, 'বরং আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করবে না'।[৩]

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে হাঁটছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা পাড় বিশিষ্ট একটি নাজরানী চাদর। এমতাবস্থায় এক বেদুঈন ছাহাবী এসে রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং রাসূল ﷺ-এর চাদর ধরে এত জোরে টান দেন যে, তার ঘাড়ে সেই চাদরের দাগ বসে যায়। অতঃপর সেই ছাহাবী বলেন, মুহাম্মাদ! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে সম্পদ দান করেছেন, তা হতে আমাকে কিছু দেওয়ার আদেশ প্রদান করুন।

নবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তারপর তাকে কিছু দেওয়ার আদেশ দিলেন।[৪]

এমন কিছু ঘটলে ক্রোধ সংবরণ করা মোটেও সহজ নয়। কিন্তু যার হৃদয়ে রাসূল ﷺ-এর প্রকৃত ভালোবাসা আছে, তার জন্য এটি কঠিন নয়।

রাগ নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা প্রদান:

রাসূল ﷺ যেমন ক্রোধ সংবরণের নযিরবিহীন উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন, তেমনই ছাহাবায়ে কেরামকেও এর শিক্ষা

* কালিয়াচক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত; মুহাদ্দিছ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩১৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৬২।

২. পাথর মেরে রক্তাক্ত করা ইত্যাদি মর্মে যা কিছু বলা হয় সব দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: আকরাম আল-উমরী, আস-সীরাহ, ১/১৮৫। কিন্তু উপরিউক্ত হাদীছ থেকে সেই অতল বেদনা প্রতীয়মান হয়।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৯৫।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৫৭।

দিয়েছেন। কেননা ক্রোধ দমন করা এমন এক গুণ, যার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ‘যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষকে ক্ষমাকারী। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন’ *(আলে ইমরান, ৩/১৩৪)*।

আর যারা ক্রোধ দমন করতে পারে এবং মানুষদের ক্ষমা করে দেয়, তারা মুহসিনদের (সৎকর্মশীল) অন্তর্ভুক্ত।[৫]

ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, এক ছাহাবী রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, ‘তুমি রাগ করো না’। সেই ছাহাবী বারবার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে লাগলেন, আপনি আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। উত্তরে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই বাক্য বারংবার বলতে লাগলেন, ‘তুমি রাগ করো না, তুমি রাগ করো না’।[৬]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বারবার ক্রোধ দমনের নির্দেশ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, ক্রোধ কতটা খারাপ ও ক্ষতিকারক।[৭]

রাগের সময় করণীয়:

সুলায়মান ইবনে সুরদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ‘একবার আমরা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁর সম্মুখেই দুজন ব্যক্তি গালাগালি করছিল। তাদের একজন অপরজনের প্রতি এত রেগে গিয়েছিল যে, তার চক্ষুদয় রক্তিম হয়ে গিয়েছিল এবং ঘাড়ের রগগুলো ফুলে উঠেছিল। তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ত, তবে তার রাগ দূর হয়ে যেত। বাক্যটি হলো- আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম’। তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বললেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলছেন, তা কি তুমি শুনছ না? তিনি বললেন, আমি নিশ্চয়ই পাগল নই।[৮]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ যদি রাগের সময় ‘আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম’ পড়ে, তাহলে তার রাগ শেষ হয়ে যাবে। হাদীছটি দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, রাগ শয়তানের কুমন্ত্রণার কারণে হয়ে থাকে, যদি তা আল্লাহর জন্য না হয়। রাগ এমন এক অবস্থা, যাতে মানুষ নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অসার কথাবার্তা বলতে শুরু করে। এক পর্যায়ে অন্যের বিপক্ষে শত্রুতা পোষণ করতে আরম্ভ করে। হাদীছে উল্লিখিত ব্যক্তি সম্ভবত মুনাফেক্ব ছিল কিংবা কোনো রুক্ষভাষী বেদুঈন ছিলেন।[৯]

ক্রোধের সময় মুখে অমার্জিত ভাষা চলে আসা স্বাভাবিক। তাই এ সময় নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যখন কেউ রাগান্বিত হবে, সে যেন চুপ থাকে’।[১০+১১]

রাগী না হওয়া কি দুর্বলতা:

বহু মানুষ মনে করে যে, কেউ আমার প্রতি অন্যায় করল আর আমি কিছুই বললাম না, তাহলে তো আমি দুর্বল! আদতে কি ব্যাপারটা এমন?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে’।[১২]

উক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সেই আসলে ব্যক্তিত্বের অধিকারী। রাগ প্রশমন তাক্বওয়ার পরিচায়ক। যদি কেউ ক্রোধ দমন করতে পারে, তাহলে মানুষ তার কাছে নিজেকে নিরাপদ মনে করে এবং তার প্রতি আগ্রহী হয়। সমাজে যদি সবাই নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে সমাজে শান্তি ও ভালোবাসা বিরাজ করবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৫. তাফসীরে ত্বাবারী, ৭/২১৫।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬১১৬।
৭. শারহু মুসলিম, ১৬/১৬৩।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬১১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬১০।
৯. শারহু মুসলিম, ১৬/১৬৩।
১০. আহমাদ, হা/২১৩৬; আদাবুল মুফরাদ, হা/১৮৪।
১১. রাগের সময় করণীয় মর্মে আরও কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন- ‘যে ব্যক্তি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে যাবে, সে যেন বসে পড়ে। তারপরও যদি তার রাগ না কমে, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে’ *(আহমাদ, হা/২১৩৪৮)*। হাদীছটির সনদ দুর্বল *(দেখুন: আলবানী, যঈফা, হা/৬৬৬৪)*। কিন্তু মুসনাদ আহমাদ, হা/১১১৪৩-এ আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে এই বাক্যটি আছে, ‘যখন কেউ ক্রোধ অনুভব করবে, তখন মাটি মাটি (উদ্দেশ্য মাটিতে বসে যাওয়া হতে পারে)’। কিন্তু এই হাদীছটির সূত্রে আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জুদআন আছেন, যিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। তাই উভয় হাদীছকে সামনে রেখে বলা যেতে পারে যে, ক্রোধের সময় মাটিতে বসে যাওয়া একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। আধুনিক কিছু গবেষণায় মাটি বা প্রকৃতির নিকটবর্তী হওয়া প্রশান্তি ও স্থিরতার কারণ হিসেবে বিবেচিত। ওয়াল্লাহু আ‘লাম।
দ্বিতীয় হাদীছ ‘যদি কোনো ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে যায়, তাহলে সে যেন ওযূ করে নেয়’। এই হাদীছটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনে আতিয়্যাহ নামক একজন আছেন, যার অবস্থা অজ্ঞাত। তাই হাদীছটি যঈফ *(দেখুন: তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৪৫)*।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৬১১৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০৯।

উত্তরায় বিমান বিধ্বস্ত: ইতিহাসে ভয়াবহতার নতুন সংযোজন

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

২১ জুলাই ২০২৫। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক শোকাবহ দিন। রাজধানী ঢাকার উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে হঠাৎ করেই দেখা দেয় এক মর্মান্তিক দৃশ্য—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান ‘এফ-৭ বিজিআই’ বিকট শব্দে আছড়ে পড়ে স্কুল শাখার একটি ভবনে। সেই সময় শ্রেণিকক্ষে ছিলেন বহু শিক্ষার্থী। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মৃত্যু গ্রাস করে ফেলে কোমলমতি অনেক ছাত্রছাত্রীর জীবন।

সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী, (২৮ জুলাই পর্যন্ত) এ দুর্ঘটনায় ৩৪ জন নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী। আহত হয়েছেন আরও শতাধিক। তাদের অনেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার ভয়াবহতা শুধু নিহত ও আহতের সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই ঘটনা বাংলাদেশের সামরিক ও নাগরিক বিমান ইতিহাসে এক বিরল ও হৃদয়বিদারক সংযোজন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিমানের ইতিহাসে বাংলাদেশ: দুর্ঘটনার ছায়া

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, গত ৩৪ বছরে অন্তত ৩২টি সামরিক বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশই প্রশিক্ষণ চলাকালে, আর যেগুলোর বেশিরভাগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল পিটি-৬, ইয়াক-১৩০, এল-৩৯ এবং এফ-৭ সিরিজের যুদ্ধবিমান।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১৯৯১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সকল বড় বিমান দুর্ঘটনার তালিকা তুলে ধরা হলো, যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিংবা প্রাণহানি ঘটেছে—

৯ মে ২০২৪: ইয়াক-১৩০ প্রশিক্ষণ বিমান, কর্ণফুলী নদীর মোহনায় বিধ্বস্ত; স্কোয়াড্রন লিডার মুহাম্মাদ আসিম জাওয়াদ নিহত।

২৩ নভেম্বর ২০১৮: এফ-৭ বিজি যুদ্ধবিমান, টাঙ্গাইলে রকেট ফায়ারিং অনুশীলনের সময় বিধ্বস্ত, পাইলট নিহত।

১ জুলাই ২০১৮: কে-৮ডব্লিউ প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত, দুই পাইলট নিহত।

২ জানুয়ারি ২০১৮: মিল এমআই-১৭ হেলিকপ্টার, শ্রীমঙ্গলে বিধ্বস্ত, কুয়েতি সামরিক কর্মকর্তাসহ কয়েকজন হতাহত হন।

২৬ ডিসেম্বর ২০১৭: দুইটি ইয়াক-১৩০ কক্সবাজারে বিধ্বস্ত।

১১ জুলাই ২০১৭: ইয়াক-১৩০ চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় বিধ্বস্ত, পাইলটরা ইজেক্ট করেন।

২১ জুলাই ২০১৫: এমআই-১৭১এসএইচ হেলিকপ্টার, মিরসরাইয়ে জরুরী অবতরণকালে ক্ষতিগ্রস্ত।

২৯ জুন ২০১৫: এফ-৭এমবি যুদ্ধবিমান, পতেঙ্গা উপকূলে বিধ্বস্ত, ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট তাহমিদ নিহত।

১৩ মে ২০১৫: এমআই-১৭১ এসএইচ হেলিকপ্টার, শাহ আমানত বিমানবন্দরে বিধ্বস্ত, ১ প্রশিক্ষক নিহত।

৩০ এপ্রিল ২০১৪: পিটি-৬ প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪: পিটি-৬ প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত।

২০ মে ২০১৩: এল-৩৯ প্রশিক্ষণ বিমান, যশোরে রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে।

১৪ জুলাই ২০১৩: ন্যাঞ্জাং এ-৫ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত।

৮ এপ্রিল ২০১২: এল-৩৯ অ্যালবাট্রস জেট ট্রেনার, মধুপুরে বিধ্বস্ত, ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট রেজা শরীফ নিহত।

২০ ডিসেম্বর ২০১০: পিটি-৬ প্রশিক্ষণ বিমান, বরিশালে বিধ্বস্ত, দুই স্কোয়াড্রন লিডার নিহত।

২০১০: এফ-৭এমবি যুদ্ধবিমান, পতেঙ্গায় বিধ্বস্ত।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০: পিটি-৬ প্রশিক্ষণ বিমান, কর্ণফুলী নদীতে বিধ্বস্ত।

২২ অক্টোবর ২০০৯: পিটি-৬ ট্রেনার বিমান, বগুড়া সদরে বিধ্বস্ত।

১৬ জুন ২০০৯: এফটি-৬ যুদ্ধবিমান, চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে বিধ্বস্ত।

৮ এপ্রিল ২০০৮: এফ-৭এমবি যুদ্ধবিমান, টাঙ্গাইলের পাহাড়িয়া গ্রামে বিধ্বস্ত, স্কোয়াড্রন লিডার মোরশেদ নিহত।

৯ এপ্রিল ২০০৭: পিটি-৬ ট্রেনিং বিমান, যশোরে বিধ্বস্ত, ফ্লাইট ক্যাডেট ফয়সাল মাহমূদ নিহত।

২৪ এপ্রিল ২০০৬: পিটি-৬, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহে বিধ্বস্ত, ফ্লাইট ক্যাডেট তানজুল ইসলাম নিহত।

৭ জুন ২০০৫: এফ-৭এমবি যুদ্ধবিমান, উত্তরায় বহুতল ভবনের সঙ্গে সংঘর্ষ।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫: পিটি-৬ প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত।

২০০৩: পিটি-৬ প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত।

১৫ নভেম্বর ২০০৩: পাইপার সেসনা এস-২ বিমান বিধ্বস্ত।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩: এফটি-৭বি বিমান বিধ্বস্ত।

১৯ অক্টোবর ২০০২: এমআই-১৭-২০০ হেলিকপ্টার, কক্সবাজার উখিয়ায় বিধ্বস্ত, ৪ জন নিহত।

৩০ জুলাই ২০০২: এ-৫সি যুদ্ধবিমান, চট্টগ্রামে বিধ্বস্ত, ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট আদনান নিহত।

* চিকিৎসক, কলামিষ্ট ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

৭ জানুয়ারি ২০০১: এফটি-৭বি ট্রেনার যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত, স্কোয়াড্রন লিডার মুহাম্মাদ মহসিন নিহত।
১৭ নভেম্বর ১৯৯৮: ন্যাঞ্জাং এ-৫সি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত।
২৬ অক্টোবর ১৯৯৮: এফ-৭এমবি বিধ্বস্ত।
৮ মে ১৯৯৬: একটি মিগ-২১ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত।
১৯৯৪: একটি এফ-৭ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত।
১৯৯৩: দুটি পিটি-৬ ট্রেনিং বিমান সংঘর্ষ, তিন পাইলট নিহত।
১৯৯৩: একটি এফটি-৫ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত, ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট কুদ্দুস নিহত।
৩০ এপ্রিল ১৯৯১: ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ৪০টি এফ-৬ এবং ৪টি মিল-৮ হেলিকপ্টার সম্পূর্ণ ধ্বংস।
বাংলাদেশের কয়েকটি বিমানের ভাগ্যেও জুটেছে এমন ঘটনা। তেমন কিছু আলোচিত বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত—

১৯৮৪ সাল: এ বছরের ৫ আগস্ট ঢাকায় খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে অবতরণ করার সময় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফকার এফ২৭-৬০০ বিমানটি বর্তমান শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছাকাছি একটি জলাভূমির মধ্যে ক্র্যাশ করে। বিমানটি চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বিমানবন্দর থেকে পূর্বনির্ধারিত ঘরোয়া যাত্রী ফ্লাইট পরিচালনা করছিল। এতে ৪ জন ক্রু ও ৪৫ জন যাত্রীসহ সবাই নিহত হন।

১৯৯৭ সাল: এ বছরের ২২ ডিসেম্বর ৮৫ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া ফকার এফ২৮-৪০০০ মডেলের বিমানটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট বিজি-৬০৯ ঢাকা থেকে সিলেট যাচ্ছিল। সিলেট বিমানবন্দরে অবতরণ করার সময় কুয়াশার কারণে রানওয়ের পাদদেশ থেকে ৫ থেকে সাড়ে ৫ কিলোমিটার দূরে উমাইরগাঁও নামক স্থানের একটি ধানক্ষেতে বিধ্বস্ত হয়। এতে ১৭ জন যাত্রী আহত হন।

২০০৪ সাল: এ বছরের ৮ অক্টোবর আবারও সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা ঘটে। এটিও ১৯৯৭ সালে দুর্ঘটনার কবলে পড়া বিমানের মডেলের অনুরূপ ফকার এফ২৮-৪০০০ মডেল। সেদিন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট বিজি-৬০১ ঢাকা থেকে সিলেট যাচ্ছিল। অবতরণের পর রানওয়ে ভেজা থাকার কারণে বিমানটি রানওয়ে থেকে ছিটকে খাঁদে পড়ে যায়। এতে ৭৯ জন যাত্রী ও ৪ জন ক্রুর মধ্যে ২ জন যাত্রী আহত হন।

২০১৫ সাল: এ বছরের আগস্ট মাসে সিলেট বিমানবন্দরের রানওয়েতে আরেক দফা দুর্ঘটনা ঘটে। সেদিন দুবাই থেকে সরাসরি আসা উড়োজাহাজে ২২০ জন যাত্রী ছিলেন। ওই সময় বিজি-৫২ বিমানের ডানদিকের ইঞ্জিনের ভেতর পাখি ঢুকে পড়ে। তখন চারটি ব্লেড ভেঙে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। সেদিন সকাল ৭টায় রানওয়েতে অবতরণের সময় এ ঘটনা ঘটে। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

২০১৫ সাল: এ বছরের ৯ই মার্চ কক্সবাজারে একটি কার্গো বিমান বঙ্গোপসাগরে বিধ্বস্ত হয়। সে ঘটনায় পাইলটসহ ৩ জন নিহত হন। উড্ডয়নের ৫ মিনিটের মাথায় সাগরে আছড়ে পড়ে বিমানটি।

বিমান দুর্ঘটনার কারণ:

পাইলটের ত্রুটি: পাইলটের ভুল সিদ্ধান্ত, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, ক্লান্তি বা চাপের কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

যান্ত্রিক ত্রুটি: বিমানের যন্ত্রাংশ বা সিস্টেমের ত্রুটি দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। যেমন, ইঞ্জিনের সমস্যা, ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেমের ত্রুটি ইত্যাদি।

খারাপ আবহাওয়া: খারাপ আবহাওয়া, যেমন- ঝড়, বৃষ্টি, ঘন কুয়াশা ইত্যাদি বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এবং দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

অন্যান্য প্রযুক্তিগত সমস্যা: নেভিগেশন সিস্টেমে ত্রুটি, যোগাযোগে সমস্যা বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে দুর্ঘটনা হতে পারে।

ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ: ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও বিমান দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বিমান দুর্ঘটনার প্রতিকার:

বিমানের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ: বিমানের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং টেকনিক্যাল চেক করা উচিত, যাতে কোনো ত্রুটি থাকলে তা দ্রুত চিহ্নিত করে সমাধান করা যায়।

পাইলটদের উন্নত প্রশিক্ষণ: পাইলটদের উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত, যাতে তারা যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকে।

আবহাওয়া পূর্বাভাসের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার: আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত, যাতে খারাপ আবহাওয়ার কারণে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

জরুরী অবতরণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি: বিমানের জরুরী অবতরণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত, যাতে বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করতে পারে।

অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা: বিমানে উন্নত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে আগুন লাগলে তা দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ব্ল্যাকবক্স পুনরুদ্ধার: বিমান দুর্ঘটনায় ব্ল্যাকবক্স (ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার) উদ্ধার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি থেকে দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়।

জরুরী অবতরণের জন্য প্রস্তুতি: যাত্রীদের জরুরী অবতরণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ধোঁয়া থেকে বাঁচা: আগুন লাগলে দ্রুত নাক ও মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতে হবে, যাতে ধোঁয়া শ্বাসনালিতে প্রবেশ করতে না পারে।

দ্রুত বিমান থেকে বের হওয়া: আগুন বা ধোঁয়ার কারণে দেরি না করে দ্রুত বিমান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

সফরে ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলা:

সফরে পঠিতব্য দু'আ ও যিকির-আযকার যথারীতি পাঠ করা। নিচে এ সংক্রান্ত আলোচনা উল্লেখ করা হলো:

(১) বাড়ির বাহিরে বিশেষত দূরবর্তী কোনো জায়গায় সফর করার ইচ্ছা করলে সেক্ষেত্রে মুস্তাহাব হলো দুই রাকাআত ছালাত আদায় করে তারপর বের হওয়া। এটা ব্যক্তিকে মন্দ প্রবেশ ও বহির্গমন থেকে রক্ষা করবে।[১]

(২) বাড়ি থেকে সফরে বের হওয়ার সময় পরিজনের উদ্দেশ্যে এই দু'আ বলবে,

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ.

অর্থ: 'আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর নিকট আমানত রাখছি, যার আমানত নষ্ট হয় না'।[২]

(৩) কেউ সফর করলে পরিজনের উচিত বিদায়কালে তার উদ্দেশ্যে নিম্নের দু'আ বলা,

(ক)

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.

অর্থ: 'আমি তোমার দ্বীন, আমানত এবং আমলের শেষ পরিণতিকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখছি'।[৩]

(খ)

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ويَسَّرَ لَكَ الـخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ.

অর্থ: 'আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়ার পাথেয় দান করুন, তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং যেখানেই থাক, তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করুন'।[৪]

(গ)

اَللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ.

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি ওর জন্য (সফরের) দূরত্বকে সংকুচিত করে দাও এবং সফরকে সহজ করে দাও'।[৫]

(৪) সফরের জন্য যখন বাড়ি থেকে বের হবে, তখন বলবে,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

অর্থ: 'আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আর আল্লাহর তওফীক্ব ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার শক্তি কারও নেই'।

এই দু'আ পড়ে ঘর থেকে কোথাও বের হলে পাঠকারীর জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হন, তাকে পথ নির্দেশ করা হয়, সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করা হয় এবং শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।[৬]

(৫) আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে এই দু'আ পড়তে হয়,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

অর্থ: 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি স্পষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদস্খলন হয় বা পদস্খলন করানো হয়, আমি অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয়—এসব থেকে'।[৭]

(৬) আরও বলবে,

بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ﴾، «الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

অর্থ: 'আল্লাহর নামে; আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি একে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথা আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের রব্বের দিকে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র-মহান; আমি আমার নিজের উপর যুলম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে মাফ করে দিন। কেননা, আপনি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই'।[৮]

(৭) আরও বলবে,

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ﴾ «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

---

১. সিলসিলা ছহীহা, হা/১৩২৩।
২. মুসনাদে আহমাদ, ২/৪০৩; ইবনু মাজাহ, ২/১৩৩।
৩. মুসনাদে আহমাদ, ২/৭; তিরমিযী, ২/১৫৫।
৪. তিরমিযী, হা/১৫৫।
৫. তিরমিযী, হা/৩৪৪৫।
৬. তিরমিযী, ৩৪২৬, হাদীছ ছহীহ।
৭. তিরমিযী, হা/৫০৯৪, হাদীছ ছহীহ।
৮. আবূ দাঊদ, হা/২৬০২; তিরমিযী, হা/৩৪৪৬।

অর্থ: ‘আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথা আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রব্বের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে আপনার কাছে চাই পুণ্য ও তাক্বওয়া এবং এমন কাজ যা আপনি পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই সফরে আমাদের সাথী এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধায়নকারী। হে আল্লাহ! আমরা আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট-ক্লেশ থেকে, অবাঞ্ছিত অবস্থার দৃশ্য থেকে এবং সম্পদ ও পরিবারে অনিষ্টকর প্রত্যাবর্তন থেকে’।

(৮) কোনো নগর বা জনপদে প্রবেশ করার সময় বলবে,

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرَضِينِ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا.

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! হে সপ্তাকাশ ও যা কিছুকে তা ছেয়ে আছে তার প্রতিপালক! হে সপ্ত পৃথিবী ও যা কিছু তা বহন করে তার প্রতিপালক! হে শয়তানদল ও তারা যাদেরকে ভ্রষ্ট করে তাদের প্রতিপালক! হে বায়ু ও যা কিছু তা উড়িয়ে থাকে তার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই গ্রাম ও গ্রামবাসীর এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অমঙ্গল হতে পানাহ চাচ্ছি’।[৯]

(৯) সফরে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ‘বিসমিল্লাহ’ বলবে। এতে শয়তান মাছির মতো নগণ্য হয়ে যায়।[১০]

(১০) উঁচুতে আরোহণ করার সময় ‘আল্লাহু আকবার’, আর নিচে নামার সময় ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা।[১১]

(১১) সফরে বা অন্য অবস্থায় কোনো ঘরে অবতরণ করলে এই দু‘আ বলা,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

অর্থ: ‘আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের অছীলায় আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই’।[১২]

(১২) সফর থেকে ফেরার সময় প্রতিটি উঁচু স্থানে তিন বার তাকবীর দিবে, তারপর বলবে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

‘একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর; আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের রব্বের প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, আর তিনি সকল বিরোধী দল-গোষ্ঠীকে একাই পরাস্ত করেছেন’।[১৩]

(১৩) আর তাতে আরও যোগ করতেন,

آيِبُونَ، تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

‘আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের রব্বের প্রশংসাকারী’।[১৪]

(১৪) সফর থেকে ফিরে এসেও দুই রাকআত ছালাত পড়া সুন্নাত।[১৫]

(১৫) সালাম দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করা; এতে সে ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্বে চলে যায়।[১৬]

পরিশেষে বলতে চাই, প্রশিক্ষণ বিমানের অনুশীলন জনবসতি থেকে দূরে নির্ধারিত নিরাপদ এলাকায় পরিচালনা করা উচিত। প্রশিক্ষণরত পাইলটদের নিয়ন্ত্রণে ভুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই জনবসতিপূর্ণ এলাকা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আকাশসীমায় অনুশীলন ঝুঁকিপূর্ণ। দুর্ঘটনা ঘটলে জানমালের বড় ক্ষতি হতে পারে। এজন্য এমন এলাকাকে অনুশীলনের জন্য বেছে নিতে হবে, যেখানে মানুষের বসবাস ও জনসমাগম কম এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনায় ক্ষতির আশঙ্কাও কম থাকবে। এতে প্রশিক্ষণও নিরাপদ হবে, জনগণের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে বিমান দুর্ঘটনা একটি জটিল সমস্যা, যা বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে ঘটে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে যান্ত্রিক ত্রুটি, আবহাওয়ার অবস্থা এবং পাইলটের ভুল বা ত্রুটি। বিমান দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। তাই বিমান দুর্ঘটনা একটি সম্মিলিত সমস্যা, যা প্রতিরোধ করার জন্য বিমান সংস্থা, সরকার এবং যাত্রী সকলেরই সচেতন হতে হবে। এছাড়াও, যাত্রী নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত।

৯. ইবনুস সুন্নী, ৫২৪।
১০. আবূ দাঊদ, হা/৪৯৮২।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৯৩।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭০৯।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪৪।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪২।
১৫. সিলসিলা ছহীহা, হা/১৩২৩।
১৬. আদাবুল মুফরাদ, হা/১১০৪।

হতাশা থেকে মুক্তির মেডিসিন

-রাকিব আলী*

[১]

ভাবুন তো, আপনি ভুলে কাউকে হত্যা করে ফেলার মতো বড় কোনো বিপদে পড়ে যালেম শাসকের অত্যাচারের ভয়ে নিজের জন্মস্থান ঘরবাড়ি, প্রিয় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে কোনো এক অচেনা স্থানে গিয়ে ঠাঁই নিলেন। এমনই এক পরিবেশে আপনার অবস্থান, যেখানে না আছে আপনার কোনো আত্মীয়, না আছে আপনার কোনো বন্ধুবান্ধব। কেউ নেই আপনার সেখানে। দুপুরে কোথায় খাবেন, কী খাবেন এগুলোর কিছুই আপনি জানেন না। এমনকি আজ খোলা আকাশের নিচে রাত্রিযাপন করা ছাড়া আপনার আর দ্বিতীয় কোনো পথও খোলা দেখছেন না। আজ এতটাই অসহায় আপনি। বড় কঠিন এক সময় অতিবাহিত করার আভাস পাচ্ছেন।

এই যে একটি দৃশ্যপট ভাবার কথা আপনাকে বলা হলো, কল্পনার জগতে এই পরিস্থিতিতে নিজেকে দাঁড় করিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করুন তো বাস্তবে এরকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেলে আপনাকে কতটা করুণ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তখন আপনি নিশ্চয়ই অনেক বড় অসহায় হয়ে পড়বেন, তাই না! আল্লাহ তাআলা সাধারণত মানুষকে তার ঘরবাড়ি, সকল আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, চাকরি, খাওয়ার ব্যবস্থা হারানোর মতো ভয়াবহ ব্যবস্থায় ফেলেন না। তবে কেউ যদি এরকম পরিস্থিতির স্বীকার হয়েই যায়, তবে তার আশাহত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বলাই বাহুল্য, মূসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা তাকে অনেক বেশি অনুপ্রেরণা যোগাবে, যোগাবে সাহস, যোগাবে মানসিক শক্তি।

অনেক চেষ্টা করার পরও আপনার হয়তো চাকরি হচ্ছে না, বয়স অনেক হয়ে গেছে কিন্তু এখনো বিয়ে হচ্ছে না, পরিবারের সবার অবস্থান আপনার প্রতিকূলে, কারো কাছ থেকে সামান্য সান্ত্বনাটুকু পাচ্ছেন না, নিজের অতি আপনজনও অচেনা আচরণ করছে, সবাই কাছে থেকেও যেন আপনার কাছে কেউ নেই, আপনি বড় একা অনুভব করছেন, ক্যারিয়ার থেকে শুরু করে নানান কারণে হতাশায় আপনার চলার পথটুকু যেন অন্ধকার হয়ে আসছে, মনে হচ্ছে বেঁচে থাকাটাই বৃথা। জীবনের এমন অসহায় পরিস্থিতিতে কুরআন আমাদেরকে মূসা আলাইহিস সালাম-এর জীবনের ঘটনা থেকে মোটিভেশন নেওয়ার শিক্ষা দেয়।

যুবক বয়সে একবার মূসা আলাইহিস সালাম একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার স্বীকার হয়ে ফেরাউনের হত্যার ভয়ে নিজের আপন বাড়ি ছেড়ে মাদইয়ান নামক এক স্থানে যাত্রা শুরু করলেন। পেছনে নিজের বাড়ি, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে ফেলে অচেনা এক জায়গায় যাচ্ছেন। সেই যাত্রা পথে তিনি যেতে যেতে আল্লাহ তাআলাকে কী বলেছিলেন জানেন? তিনি বলেছিলেন, ﴿عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ 'আমি আশা করি আমার মালিক আমাকে সঠিক পথই দেখাবেন' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/২২)*।

এই কথাটির মানে কী, জানেন? এর মানে হচ্ছে, তিনি আল্লাহ তাআলার ওপর সুধারণা রেখেছেন। সেই সুধারণা এরকম যে, আল্লাহ তাআলা তাকে সেদিকেই যাওয়ার তাওফীক্ব দিবেন, যেদিকে গেলে তিনি সঠিক পথ পাবেন, যেদিকে গেলে তার কোনো অকল্যাণ হবে না, যেদিকে গেলে তার জন্য সবকিছু সহজ হবে। এই আয়াত দিয়ে বোঝা যায়, তিনি আল্লাহর ওপর কতটা গভীর ভরসা রেখেছিলেন। সুবহানাল্লাহ! আমরা কি বিপদ-আপদে পড়ে আল্লাহকে স্মরণ করছি? মূসা আলাইহিস সালাম-এর মতো আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে পারছি? আল্লাহ আমাদের জীবনের সকল সমস্যাকে মুহূর্তেই সমাধান করে দিতে পারেন, আমাদের দৃষ্টিতে সকল অসম্ভবকে 'সম্ভব' করে দিতে পারেন সেই সুধারণা কি আমরা রাখছি? আল্লাহ বলেছেন, আমি সেরকমই, যেরকম আমার বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে।[১]

মনে করুন, ইচ্ছা থাকার পরও বিভিন্ন সমস্যার কারণে এখন বিয়ে করাটা আপনার কাছে এক প্রকার 'অসম্ভব' মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনি সুধারণা করলেন যে, আমার রব চাইলেই আমার বিয়েকে সহজ করে দিতে পারেন, তবে আল্লাহ তা-ই করবেন। পক্ষান্তরে, আপনি যদি মনে করেন, এত কঠিন সমস্যার মধ্যে এটা আসলে কখনোই সম্ভব হবে না, তবে আল্লাহ তা-ই করবেন অর্থাৎ আপনার ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ অসম্ভবকে 'অসম্ভবই' রেখে দিবেন। ঐ হাদীছ তেমনটাই বলছে। শুধু বিয়েই নয়। আয়-রোজগার থেকে শুরু করে বিদেশ যাত্রার মতো অন্য সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর প্রতি সুধারণা থেকেই ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব।

যাহোক, মূসা আলাইহিস সালাম-এর ঐ কথায় প্রমাণ করে তিনি তার করুণ অবস্থায়, জীবনের কঠিন সময়ে আল্লাহর ওপর শতভাগ ভরসা করতে ভুলে যাননি, রবের ওপর তার ভরসার জায়গা একটুও নড়বড়ে ছিল না, ছিল না সুধারণারও কোনো ঘাটতি। আল্লাহ সাহায্য করবেনই

* আম্বরখানা, সিলেট।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪০৫।

করবেন- এমন দৃঢ় বিশ্বাস তিনি অন্তরে লালন করেছিলেন। আর রবের ওপর এমন ভরসার তাৎক্ষণিক ফলও তিনি হাতেনাতে পেয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণরূপে কল্পনাতীত।

প্রসঙ্গক্রমে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য সংকট থেকে বের হয়ে আসার জন্য একটা পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক্ব (হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা, উত্তম স্বামী-স্ত্রী, নেক সন্তান এগুলোও রিযিক্বের অন্তর্ভুক্ত) দান করেন যার উৎস সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট’ *(আত-তালাক, ৬৫/২-৩)*। এই আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন আমরা মূসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনার মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাই। আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত আয়াতের বাস্তবতা মূসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যদি মূসা আলাইহিস সালাম-এর মতো আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে পারি, তবে আল্লাহ আমাদেরকেও সাহায্য করবেনই যে সাহায্যের কথা আমরা ভাবতেও পারবো না। সুবহানাল্লাহ!

আমাদের শুধু প্রয়োজন ভরসার জায়গায় নড়বড়ে না থাকা।

[২]

আল্লাহর ওপর মূসা আলাইহিস সালাম-এর ভরসামূলক ঐ কথা উল্লেখ করার পরপরই আল্লাহ তাআলা বলছেন, অবশেষে যখন সে মাদইয়ানের একটি পানির কূপের কাছে পৌঁছল, তখন দেখল তার পাশে অনেক মানুষ, তারা পশুদের পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের অদূরে সে দুজন রমণীকে দেখতে পেল, যারা নিজ নিজ পশুদের আগলে রাখছে, সে তাদের জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কী হলো তোমরা যে পশুদের পানি খাওয়াচ্ছ না? তারা বলল, আমরা পশুদের পানি খাওয়াতে পারব না যতক্ষণ এ রাখালরা তাদের পশুদের সরিয়ে না নিয়ে যায় এবং আমাদের পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ তাই আমরাই পশুদের পানি খাওয়াতে নিয়ে এসেছি। একথা শোনার পর সে এদের পশুগুলোকে পানি খাইয়ে দিল, তারপর সরে একটি গাছের ছায়ার নিচে বসল এবং আল্লাহকে বলল, ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ ‘হে আমার রব! নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাযিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী’ *আল-ক্বাছাছ, ২৮/২৪)*।

এই দু‘আটি যতটুকু না ছোট্ট দেখা যাচ্ছে তার চেয়েও বেশি ভারী একটি দু‘আ। কথাগুলো নিয়ে আপনি যতই চিন্তা করবেন ততোই মুগ্ধ হবেন। এই কথাগুলোর মানে হচ্ছে, আল্লাহ যা দিবেন তাতেই তিনি খুশি থাকবেন। এমনকি আল্লাহ যদি কিছু না-ও দেন তাতেও তার কোনো অভিযোগ থাকবে না। তিনি আল্লাহর দেওয়া না দেওয়া উভয় অবস্থায়ই খুশি। ‘আপনি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তারই মুখাপেক্ষী’ এটা বলে তিনি মূলত বলটা আল্লাহর কোটায় দিয়ে দিলেন। তিনি নির্দিষ্ট করে কোনো চাওয়া পাওয়ার কথা বলেননি। বরং আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যা ভালো মনে করে দিবেন, সেটাই ভালো। আল্লাহর যেকোনো ফয়সালা মেনে নেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত।

এই দু‘আ পাঠ করার সাথে সাথেই আল্লাহ তাআলা তাকে এমন ব্যবস্থা করে দিলেন, যা রীতিমতো অকল্পনীয়। আল্লাহ তাআলার নেয়ামত আসতে একটুও দেরি হলো না। এর পরের ঘটনা নিয়ে আল্লাহ তাআলা বলছেন, মূসা দেখতে পেল, সে দুই রমণীর একজন লজ্জা জড়ানো অবস্থায় তার কাছে এলো এবং বলল, আমার পিতা আপনাকে তার কাছে ডেকেছেন, আপনি যে আমাদের পশুগুলোকে পানি খাইয়ে দিয়েছিলেন তার জন্য তিনি আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে চান; অতঃপর সে তার কথামতো তার পিতার কাছে এলো এবং নিজের কাহিনী তার কাছে বর্ণনা করলো, সব শুনে সে মূসাকে বলল, তুমি কোনো ভয় করো না। এখন তুমি যালেমদের কাছ থেকে বেঁচে গেছ।

প্রসঙ্গত, একজন বিপদগ্রস্তের সাথে কেমন আচরণ করতে হয় তার চমৎকার এক শিক্ষা আমরা এ ঘটনা থেকে পাই। মূসা আলাইহিস সালাম যখন ঐ রমণীদের পিতার কাছে তার পুরো ঘটনা খুলে বলছিলেন, তখন কিন্তু তিনি তার আলাইহিস সালাম কথা মন দিয়ে প্রথমে শুনছিলেন যে, কীভাবে কী হলো! আমরা কি বিপদগ্রস্তের কথা আগে মন দিয়ে শুনার চেষ্টা করি? তারপর অভয় দিয়ে তাকে সান্ত্বনার বাণী শুনালেন যাতে তিনি ঘাবড়ে না যান, ভয়ে আরও দুর্বল হয়ে না পড়েন। এমনকি তিনি অবশেষে নিজের বাড়িতে পর্যন্ত আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমরা হলে আশ্রয় দেওয়া তো দূরের কথা, অভয় দিয়ে কথা বলে সামান্য সান্ত্বনাটুকু কি দেই?

আমরা হলে বিপদগ্রস্তের বিপদের কথা ভালো করে না শুনেই মন্তব্য করে বসতাম, আরে! তুমি এত বড় কাণ্ড করে ফেলেছ। কেমনে এত বড় অপরাধ করতে পারলে? তুমি তো একজন আস্ত খুনি। একজন খুনির জায়গা আমার বাড়িতে হতে পারে না। জলদি এখান থেকে কেটে পড়ো। এভাবে বলে লোকটাকে মানসিকভাবে আরও দুর্বল করে দিতাম, দূরে ঠেলে দিতাম। এই আচরণ আপনার বিপদে আপনার সাথে করলে কেমন লাগবে ভাবুন তো। যে আচরণ নিজের বিপদে সহ্য করা যায় না, সে আচরণ অন্যের বিপদে আমি কীভাবে অনায়াসে করতে পারি? ঐ বৃদ্ধ লোকটির আচরণের কথাই চিন্তা করুন। কত মায়া লাগে বিপদগ্রস্তের সাথে তার অমায়িক আচরণের কুরআনিক বর্ণনা শুনে। আর আমরা এমন আচরণ থেকে কত দূরে, আফসোস!

বিপদের সময় মানুষের আচরণ হৃদয়ে প্রচণ্ড দাগ কেটে যায়। এ সময়ে কারো করা আচরণ কোনোদিন ভুলা যায় না, হোক সেটা ভালো কিংবা খারাপ আচরণ। এজন্য আমরা যেন কারো বিপদে বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে হলেও এমন কোনো আচরণ না করি, যে আচরণ তার কষ্টকে আরও বাড়িয়ে দেয়, যে আচরণ তার মন খারাপ করে দেয়, যে আচরণ সারাজীবন তার স্মৃতির পাতায় ভেসে বেড়ায়। যে বিপদে পড়ে, সে বুঝে সে কত কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। এসময় মানুষের একটুখানি সহানুভূতি পাওয়া, সান্ত্বনা বাণী শোনা অনেক দামি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, অনেক দামি।

তারপর সে দুজন রমণীর একজন তার পিতাকে এসে বলল, হে আমার পিতা! উনাকে বরং তুমি তোমার কাজে নিয়োগ করো, কেননা তোমার মজুর হিসেবে সে ব্যক্তিই উত্তম বলে প্রমাণিত হবে, যে হবে শারীরিক দিক থেকে শক্তিশালী এবং চরিত্রের দিক থেকে বিশ্বস্ত। এরপর রমণীদের পিতা তাকে বলল, আমি আমার এ দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, তবে তা হবে এ কথার ওপর তুমি ৮ বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি আট বছরের পরিবর্তে ১০ বছর পুরো করতে চাও তবে তা হবে তোমার একান্ত ব্যাপার, আমি তোমার ওপর কোনো কষ্টকর শর্ত আরোপ করতে চাই না; আল্লাহ তাআলা চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাবে। সে এতেই রাজি হলো এবং বলল ঠিক আছে, আমার এবং আপনার মাঝে এ চুক্তিই পাকা হয়ে থাকল *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/২৩-২৮)*।

[৩]

আমি বুঝতে পারছি, আপনি হয়তো জীবনের অনেক কঠিন সময় পার করছেন, যা হয়তো কাউকে বোঝানোও সম্ভব না। সান্ত্বনার বাণী শুনানো যত সহজ মনটাকে শান্ত করা ততই যেন কঠিন। মানুষের বিষমাখা কথার তিরের আঘাতে কিংবা জীবনে অনেক কিছু না পাওয়ার বা হারিয়ে ফেলার কষ্টে আপনি ভীষণ আহত ও হতাশাগ্রস্ত। ভাঙা মন নিয়ে চলতে বড় কষ্ট হচ্ছে আপনার ঠিক যেমন রক্তাক্ত শরীর নিয়ে চলতে কষ্ট হয়। মনে হচ্ছে শুধু শুধু অন্ধকারপূর্ণ এ জীবন রেখে কী লাভ! মরে যাওয়াই ভালো।

প্রিয় ভাই ও বোন আমার! জীবনে আমরা যত কষ্টেই থাকি না কেন এই যে মূসা আলাইহিস সালাম তার নিজের ঘরবাড়ি, বন্ধুবান্ধব তথা কাছের মানুষ, মাথা গুঁজানোর ব্যবস্থা হারিয়ে ফেলার মতো নিঃস্ব অবস্থায় পড়ে দুর্যোগপূর্ণ সময়ের মধ্যে গিয়েছিলেন আমরা কি তার আলাইহিস সালাম চেয়েও বেশি দুঃসময় পার করছি? নিশ্চয়ই না। অনেক কষ্টে থাকলেও অন্তত তার আলাইহিস সালাম কষ্টের মতো কষ্টে নয়। সেই তিনি যদি বড় কষ্টের মুহূর্তে রবের প্রতি আশা না হারান, হতাশ না হন তবে আমরা তার আলাইহিস সালাম চেয়ে তুলনামূলক কম কষ্টে থেকে কীভাবে রবের প্রতি আশা হারিয়ে ফেলতে পারি? ডিপ্রেশনে চলে যেতে পারি? কীভাবে নিজেকে ধ্বংস করে দেওয়ার মতো বিধ্বংসী চিন্তা পর্যন্ত করে বসতে করি?

যে আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাম-এর এতো সংকটপূর্ণ অবস্থায় শুধু তার প্রতি ভরসা ও সুধারণা করার কারণে মুহূর্তের মধ্যে নিরাপদ স্থানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু তা-ই নয়। না চাইতেই পরহেজগার এক স্ত্রীর সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন, চাকরি তথা রিযিক্বের ব্যবস্থা করে দিলেন সেই একই আল্লাহ তাআলা কি আপনার আমার জীবনের সকল সমস্যা সমাধান করে দিতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। কেবল প্রয়োজন ভরসা, মূসা আলাইহিস সালাম-এর মতো শক্ত ভরসা।

কাজেই মূসা আলাইহিস সালাম-এর ন্যায় জীবনের কঠিন সময়ে হতাশ না হয়ে, ভেঙে না পড়ে, সুইসাইডের মতো পাগলামি চিন্তা না করে আল্লাহর ওপর শতভাগ ভরসা রেখে আল্লাহর কাছে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে নিজের চাওয়ার বিষয়গুলো চাইতে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে মূসা আলাইহিস সালাম-এর দু'আ বেশি বেশি পাঠ করা যেতে পারে। এই দু'আ হতাশা থেকে মুক্তির মেডিসিন হিসেবে কাজে দিবে। বিশ্বাস করুন, দেরি হলেও একদিন ঠিকই ফলাফল আপনার পক্ষেই আসবে। কেবল সময়ের অপেক্ষা। আর মনে রাখবেন, আপনার অতীতের দুর্দিনের দিনগুলো যেমন আজকের দিনে আর নেই ঠিক তেমনি আজকের দুর্দিনও একসময় থাকবে না। শীঘ্রই এগুলো কেটে যাবে। ইনশা-আল্লাহ! কেবল থেকে যাবে আজকের দিনের আপনার ভুল কোনো পদক্ষেপের আফসোস।

আক্বল বনাম নাফস: অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব ও সত্য পথে চলার সংগ্রাম

-আদিল বিন ফোরকান*

ভূমিকা:

আল্লাহ তাআলা আমাদের স্রষ্টা। তিনি আমাদের শুধু শরীর দিয়ে সৃষ্টি করেননি; বরং দিয়েছেন আত্মা, আক্বল (বিবেক-বুদ্ধি) ও নাফস (মন)। এই আক্বল ও নাফসের মাঝে প্রতিনিয়ত এক নীরব, কিন্তু ভয়াবহ যুদ্ধ চলে। এটাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় হলো আক্বল ও নাফস, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব এবং আমাদের করণীয় কী?

নাফস কী?

'নাফস' হলো মানুষের ভিতরের চাহিদা, লালসা, প্রবৃত্তি ও নিজেকে বড় ভাবার অভ্যন্তরীণ শক্তি। এই নাফসকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বিভিন্ন স্তরে বর্ণনা করেছেন। কুরআনে নাফসের তিনটি অবস্থা উল্লেখ আছে।

১. নাফসে আম্মারাহ (যেই নাফস খারাপের প্রতি আহ্বান করে): আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ 'নিশ্চয় নাফস মন্দ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে, তবে আমার রব যাকে দয়া করেন সে ছাড়া' *(ইউসুফ, ১২/৫৩)*। এটি সেই নাফস যা মানুষকে সর্বদা গুনাহ, লোভ, হিংসা, ব্যভিচার, অহংকার, অন্যায় ও অপকর্মের দিকে আহ্বান করে।

২. নাফসে লাওয়ামাহ (তিরস্কারকারী নাফস): আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ 'আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী নাফসের' *(আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/২)*। এটি সেই অন্তর, যা সবসময় নিজেকে তিরস্কার করে; ভালো কাজ করলে এই বলে তিরস্কার করে, "আরও কেন বেশি করলাম না" আর মন্দ কাজ করলে এই বলে তিরস্কার করে, "হায়! আফসোস, যদি এটা না করতাম!"

৩. নাফসে মুত্বমাইন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা): আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ 'হে প্রশান্ত আত্মা!' *(আল-ফজর, ৮৯/২৭)*। এটি হলো সেই আত্মা, যা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে তৃপ্ত, গুনাহ থেকে মুক্ত এবং নেক আমলের মাঝে প্রশান্ত।

আক্বল কী?

'আক্বল' হলো মানুষের সেই বিবেক ও যুক্তি-বুদ্ধি, যা আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন ন্যায়ের পথে চলার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ 'আমি আদমসন্তানকে মর্যাদা দিয়েছি' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৭০)*।

এই মর্যাদার অন্যতম কারণ হচ্ছে, আল্লাহ মানুষকে 'আক্বল' দিয়েছেন, যা কোনো জীবজন্তুর নেই। মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের গুনাহ করার মতো মনমানসিকতা দেননি আর জীবজন্তুর নৈতিকতা নেই। কিন্তু মানুষকে দেওয়া হয়েছে নৈতিক বিবেক আর সেই আক্বল, যা তাকে তার নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। কাজেই পাপ কাজের প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও যখন মানুষ আল্লাহকে ভয় করে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, তখনই তার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

আক্বল বনাম নাফস:

এই আক্বল ও নাফসের মধ্যেই চলে মানুষের আসল যুদ্ধ। আক্বল মানুষকে বলে, সৎ পথে চলো, সচেতন হও, আল্লাহকে ভয় করো। পক্ষান্তরে নাফস বলে, আরাম করো, পাপ করো, মানুষ দেখছে না, সমস্যা নেই।

উদাহরণস্বরূপ ধরুন, কেউ মোবাইল ফোনে হারাম কিছু দেখছে। এক্ষেত্রে আক্বল বলছে, এটা গুনাহ, আল্লাহ দেখছেন, বিরত হও; কিন্তু নাফস বলছে, কেউ দেখছে না, শুধু একবার দেখলে কিছু হয় না।

এই দ্বন্দ্বে যে নাফসের কথা শোনে, সে পাপের পথে চলে যায় আর যে আক্বলের কথা শোনে, সে জান্নাতের পথে এগিয়ে যায়।

নাফসের সাথে যুদ্ধ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ 'আর প্রকৃত মুজাহিদ হলো সে, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নাফসের সাথে জিহাদ করে'।[১] এই হাদীছে রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন, প্রকৃত জিহাদ শুধু শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ নয়; বরং নিজের ভেতরের খেয়াল-খুশি, গুনাহের প্রবণতা ও দুনিয়াবী লালসার বিরুদ্ধে লড়াই করাও একটি বড় জিহাদ।

নাফস সবসময় মানুষকে গুনাহ, অলসতা, অহংকার, হিংসা, লোভ ইত্যাদির দিকে টানে। এগুলো দমন করে আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে স্থির রাখা—এটাই হচ্ছে নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ।

নাফসকে পরাজিত করার উপায়:

১. তাওহীদ ও তাক্বওয়া বৃদ্ধি করা: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল আল্লাহভীরুদের থেকেই (তাদের কৃত আমল) কবুল করে

* শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. সিলসিলা ছহীহা, হা/৫৪৯; বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/১০৬১১।

থাকেন' *(আল-মায়েদা, ৫/২৭)*।

২. নিয়মিত তওবা করা: রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীছে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ 'আর তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা করো, হে ঈমানদারগণ!' *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।[২]

৩. সৎ ও পরহেযগার বন্ধু বেছে নেওয়া: যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা নাফসের ফাঁদ থেকে আমাদের বাঁচতে সাহায্য করে। তাই আমাদের উচিত তাক্বওয়াবান বন্ধু নির্বাচন করা।

৪. নফল ইবাদত করা: ছওম, তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নফল ইবাদত নাফসকে দুর্বল করে। নবী ﷺ বলেন, الصَّوْمُ جُنَّةٌ 'ছওম ঢালস্বরূপ'।[৩]

৫. নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদকে গুরুত্ব দেওয়া: নিজের মনের বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে। সহজে তাকে পাপের অনুমতি দিবেন না। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমি যা করছি, আল্লাহ কি তাতে খুশি হচ্ছেন?

সফলতা কোথায়?

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ 'যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে সফল হয়েছে। আর যে একে কলুষিত করেছে, সে ব্যর্থ হয়েছে' *(আশ-শামস, ৯১/৯-১০)*। অতএব, সফলতা সেই ব্যক্তির, যে নাফসকে দমন করে এবং আক্বলকে অনুসরণ করে।

উপসংহার:

সুধী পাঠক! নাফস এমন এক শত্রু, যে আমাদের নিজের ভেতরেই বাস করে। এটা আমাদেরকে গুনাহের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু আক্বল ও ঈমান আমাদেরকে সঠিক পথ দেখায়। আমরা যদি আক্বলকে প্রাধান্য দিয়ে কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা অনুসরণ করে চলি, তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হব, ইনশা-আল্লাহ!

আল্লাহ আমাদের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমাদের আক্বলকে নূরের পথ দেখান এবং তাক্বওয়ার শক্তিতে ভরপুর করে দিন- আমীন!

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭০২।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৯২।

'উকিল বাবা কালচার' প্রবন্ধটির বাকী অংশ

তবে হ্যাঁ, পিতা যদি পাগল বা অজ্ঞান হয়, তখন সে বিষয়টি আলাদা। সেক্ষেত্রে পিতা ব্যতিরেকে অন্য কারও ওলী বা অভিভাবক হওয়ার সুযোগ রয়েছে। আল্লাহর নবী ﷺ-এর হাদীছ 'অলী ছাড়া বিবাহ হয় না'-একথা প্রমাণ করে যে, আমাদের সমাজে যে সমস্ত বিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার সিংহভাগই বাতিল বলে গণ্য। কেননা এখানে একদিকে পিতা বিবাহে উপস্থিত থেকেও নিজে ওলী না হয়ে অন্য কাউকে 'উকিল' নিয়োগ করছে আবার অন্যদিকে মেয়েরা ওলী থাকা সত্ত্বেও নিজেই নিজের বিয়ে সম্পন্ন করছে। দু'টি কাজই শরীআতের বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই হাদীছে এমন বিবাহকে চূড়ান্তভাবে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বিবাহ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে ইসলামী শরীআতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এর মাধ্যমে একজন ছেলে-মেয়ের দাম্পত্য জীবনের শুভ সূচনা হয়। আবার বৈধ পন্থায় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমাজ বিনির্মাণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। এজন্য ধর্মীয় ও সামাজিক এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ শরীআত সমর্থিত পন্থায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর অন্যথা করার কারণে বিয়ে-শাদী থেকে আল্লাহর রহমত উঠে যায়।

যার ফলশ্রুতিতে আমরা সমাজে দেখি বিয়ের পরপরই বিয়ে ভেঙে যাওয়া, সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি, পরকীয়া; অবশেষে তা তালাকের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করা। এসবই হলো আল্লাহর বিধান অমান্য করে চলার বিষময় ফল। আমরা আপাতদৃষ্টিতে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি-সমৃদ্ধি দেখে থাকলেও বাস্তবে পারিবারিক ব্যবস্থায় মারাত্মক ধস নামার করুণ চিত্র দেখে কেবলই উদ্বিগ্ন হতে হয়। তাই পরিবার ব্যবস্থায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখতে আসুন সবাই মিলে আমরা এই 'উকিল বাবা' নামক কালচারসহ বিবাহ ব্যবস্থায় প্রচলিত সমস্ত সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার সমাজ থেকে দূরীভূত করি। অনৈসলামিক কৃষ্টি-কালচারের আগাছা হৃদয়-মন থেকে সমূলে উৎপাটন করে শরীআত পালনে প্রত্যেকে সচেষ্ট হই।

বিয়েবন্ধনের জন্য মেয়ের বাবা বা অভিভাবক, ছেলে (বর) ও দুজন সাক্ষীর উপস্থিতি জরুরী। এর সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে— মেয়ের বাবা সাক্ষীদ্বয়ের উপস্থিতিতে বিয়ের খুৎবা পাঠের পর ছেলেকে (বর) ইজাব (প্রস্তাব) দিবেন আর ছেলে তা কবুল (গ্রহণ) করবে। এভাবেই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে। বিয়েবন্ধনের জন্য কনের কবুল পড়ানোর নিয়ম ইসলামে নেই।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

রক্তাক্ত গাযা

-মুসাফির বাসার
রিফাইতপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

পবিত্র ভূমির পবিত্রতা নষ্ট করেছে যারা
নিষ্পাপ ছোট্ট সোনামণিদেরও শহীদ করছে ওরা।
নির্বিচারে গণহত্যা আজ চেয়ে দেখছে বিশ্ব,
রক্তের খেলায় মেতেছে ওরা মুসলিম বুঝি নিঃস্ব।
বদর-উহুদের উত্তরসূরিদের আজ অলস হয়েছে দেহ,
তাইতো শিয়াল শকুনের দলে খুবলে খাচ্ছে দেহ।
যাইতুনের ঐ গাছগুলোর জানি কি অপরাধ ছিল!
অবলা অসহায় প্রাণীগুলো ছাড় পায়নি তারও।
মসজিদের ওই মিনারগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে,
অট্টালিকাগুলো মরূদ্যান বনেছে লোকালয় বিরান গৃহে।
জঙ্গিবাদ দমনের নাটকের নামে করছে গণহত্যা,
বাদ যায়নি দুধের শিশুও বাদ যায়নি প্রসূতি-বৃদ্ধা।
হাসপাতাল, স্কুল, তাঁবু কিবা মসজিদ বাদ যায়নি কিছুই,
মৃতপ্রায় রোগীদেরও মারছে ওরা জঙ্গি বনেছে শিশু।
ত্রাণের নামে লোক জড়ো করে চালাচ্ছে খোলা গুলি।
মাদকের বড়ি মিশিয়ে তাতে উদারতার দিচ্ছে বুলি।
অন্ন ঔষধের অপেক্ষায় আজ ধুঁকে-ধুঁকে মরছে দেহ।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাশের টুকরোগুলো কাফন পায়নি কেহ।
শহীদের সংখ্যা লাখের যাত্রায় নিদ্রা কাটেনি কারো,
রক্তের ফোয়ারায় ভিজে গেছে আজ পবিত্র এই গৃহ।

মাইলস্টোনের দাবানল

-তাহমিদুল্লাহ সারাসিনী
মাইজদী, নোয়াখালী।

ঐযে মেঘের ভেলা যাচ্ছে উড়ে,
শতরঙা রামধনু নভ জুড়ে,
দুলে গাছ পক্ষিরাজের খুরে...।
মেঘের ফাঁক গলে এক পাথর,
এসে পড়লো হঠাৎ এ নিথর—
স্নিগ্ধ রঙিন ভুবনের পর...।
উঠলো বেজে হায় বজ্রনাদ!
জন্ম নিল কুবিস্তৃত খাদ,
জ্বলে গেল জীবনের সব স্বাদ...।
শিউরে ওঠে গা—জীবন্ত দেখে,
এ-তো কয়লা—দেহে অনল মেখে,
হা! ভাসে হাবিয়ার আগুন—চোখে...।

গণতন্ত্র, তুই কে?

-মো. আরিফ
পবা, রাজশাহী।

গণতন্ত্র, তুই কি সেই আশ্বাস,
যার বুকে ঝরে যায় নিরীহ জনতার নিঃশ্বাস?
তোর নামে চলে নির্বাচন—
বাক্‌স্বাধীনতা হয়ে যায় দাফন।
তুই মুখোশ পরা শাসক,
জনগণের কাঁধে বসে চেপে থাকা শকুন।
তুই এদেশে গত ৫৪ বছরের যালেম, খুনি।
তুই শান্তি আনিস চালিয়ে জনতার বুকে গুলি।
গণতন্ত্র, তুই কে?
তুই নতুন চাঁদাবাজ, তুই ফ্যাসিবাদ।
তুই ভবিষ্যতের খুনি।
তাই বলছি,
তুই গণতন্ত্র না— তুই স্বৈরশাসনতন্ত্র।
তোর নামে চলে খুন, ধর্ষণ, দমন-পীড়ন।
তাই তোকে ঘৃণা করি।
তোর নামে চুপ করে থাকা অপরাধ মনে করি।
তাইতো তোর সমাধির ওপর খেলাফতের স্বপ্ন বুনি।

ফুটবে না আর ফুলের হাসি

-মো. সামিউল ইসলাম রাসেল
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

দু চক্ষুতে অশ্রু ভরা
হঠাৎ করেই স্বজনহারা
যায় বলা ভাষা,
ফুলগুলো আজ পড়লো ঝরে
মায়ের বুকটা খালি করে
ছিল শত আশা।
সাঁঝ সকালে ঘুম শেষে
স্কুলে রোজ হেসে হেসে,
মা জননীর মানিক সোনার
হইলো না আর আসা।
দেখবে না আর ফুলের হাসি
ঝরবে না আর মুক্তারাশি,
ফুড়ুৎ করে উড়ে গেলে
খালি করে বাসা।

বাংলাদেশ সংবাদ

গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছে আওয়ামী লীগ কর্মীরা

দলীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের বেশকিছু নেতাকর্মী রীতিমতো গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। যাদের প্রধান উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে বড় ধরনের অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং হাইকমান্ডের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর ঢাকা দখলে নেওয়া। এজন্য মাস্টারপ্ল্যানের অংশ হিসাবে তালিকাভুক্ত হাজার হাজার নেতাকর্মী দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ইতোমধ্যে কোর গ্রুপের একটি বড় অংশ প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষ করেছে। অবাক হওয়ার বিষয় হলো—যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদের একটি অংশ অবসরে যাওয়া সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী। যারা এখন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। প্রশিক্ষণ হয়েছে দিল্লি, কলকাতা ছাড়াও রাজধানী ঢাকা এবং গোপালগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের আগ পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে আওয়ামী লীগের। এরই অংশ হিসাবে ৮ জুলাই রাজধানীর বসুন্ধরার একটি কনভেনশন হলে ৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ওই প্রশিক্ষণ চলাকালে কনভেনশন সেন্টারে দেওয়া হয় সরকারবিরোধী নানা স্লোগান। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ গুলশান বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) কামরুল হাসান বলেন, 'এটি একটি অনেক বড় কর্মযজ্ঞ। তদন্তের স্বার্থেই এই মুহূর্তে বিষয়টি নিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। একটু গুছিয়ে নিই। পরে বলব'। তিনি বলেন, 'এ ঘটনায় শুধু ডিবি নয়, আরও কয়েকটি সংস্থা কাজ করছে'। অপর একটি সূত্র মতে, বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ায় আওয়ামী লীগ তার স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করেছে।

মাইলস্টোন স্কুল ট্রাজেডি

ঢাকা, ২১ জুলাই ২০২৫ ইং: রাজধানীর উত্তরা এলাকার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে একটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এফ-৭ বি.জি.আই. প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে অন্তত ৩৪ জন নিহত এবং ১৬৫ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ২৫ জন শিশু শিক্ষার্থী, একজন শিক্ষক এবং পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলাম সাগর রয়েছেন। দুপুর ১টা ৬ মিনিটে বিমানটি বিমান বাহিনীর বীর উত্তম এ.কে.খন্দকার ঘাঁটি থেকে উড্ডয়ন করে। উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং স্কুলের প্রধান ভবনের নিচতলায় আঘাত হানে। বিমানটি ভবনের এক পাশ দিয়ে ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়, ফলে ভবনে আগুন ধরে যায়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে যান্ত্রিক ত্রুটির কথা জানিয়েছে। তবে, জনসাধারণের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে—পুরনো যুদ্ধবিমান কেন এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে এবং জনবহুল এলাকায় কেন প্রশিক্ষণ ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। দুর্ঘটনার পরদিন শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে এবং ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে, যার মধ্যে রয়েছে—নিহত ও আহতদের তালিকা প্রকাশ, ক্ষতিপূরণ প্রদান, পুরনো যুদ্ধবিমান বাতিল এবং প্রশিক্ষণ ফ্লাইটের নিয়মাবলি পরিবর্তন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

জাতিসংঘে ফিলিস্তীন-ইসরাঈল শান্তি উদ্যোগ: নেতৃত্বে ফ্রান্স ও সঊদী আরব

২৯ জুলাই ২০২৫, মঙ্গলবার: ফিলিস্তীন ও ইসরাঈলের মধ্যে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের আলোচনা পুনরায় শুরু করতে সোমবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘে তিন দিনব্যাপী এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন শুরু হয়েছে। সম্মেলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে ফ্রান্স ও সঊদী আরব। সম্প্রতি ফিলিস্তীনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে ফ্রান্স। এই প্রেক্ষাপটেই সম্মেলনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে ফিলিস্তীনকে বিভক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে ফিলিস্তীন রাষ্ট্র এখনও পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি। এএফপির তথ্য অনুযায়ী, জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ফ্রান্সসহ ১৪২টি দেশ ফিলিস্তীনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এবার যুক্তরাজ্যও সেই তালিকায় যোগ দিতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ, সম্প্রতি দেশটির ২২১ জন আইনপ্রণেতা নতুন প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারকে

ফিলিস্তীনকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যঁ নোয়েল ব্যারট জানান, ইউরোপের আরও কিছু দেশ ফিলিস্তীনকে স্বীকৃতি দিতে পারে।

মুসলিম বিশ্ব

রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর আরাকান আর্মির নিপীড়ন: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর কঠোর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) ২০২৫ সালের ২৮ জুলাই এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়। সংস্থাটি জানায়, আরাকান আর্মির দখলে থাকা এলাকায় রোহিঙ্গাদের চলাচলে কড়াকড়ি, বাড়িঘর লুটপাট, আটক, বাধ্যতামূলক শ্রম এবং জোরপূর্বক বাহিনীতে ভর্তির মতো নানাবিধ নিপীড়ন চলছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মতো তারাও রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত।

এইচআরডব্লিউর এশিয়া পরিচালক এলেইন পিয়ারসন বলেন, ‘আরাকান আর্মিও সেনাবাহিনীর মতোই বৈষম্যমূলক দমননীতি অনুসরণ করছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন’। ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে সংঘর্ষ বেড়ে যাওয়ার পর আরাকান আর্মি কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিলেও রোহিঙ্গাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। অভিযোগ রয়েছে, রোহিঙ্গাদের কৃষিজমি, বাড়িঘর, গবাদিপশু এমনকি কবরস্থানও দখল করে নিচ্ছে তারা। কিছু এলাকায় কবরস্থান ধ্বংস করে মরদেহ ধানক্ষেতে দাফনের নির্দেশও দিয়েছে। এদিকে রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো, বিশেষ করে আরসা, আবারও আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে চলমান সংঘাতে রোহিঙ্গারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

এইচআরডব্লিউ জানায়, ২০২৪ সালের মে থেকে এ পর্যন্ত কক্সবাজারে নতুন করে ১ লাখ ২০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে, যাদের অনেকেই কোনো সহায়তা পাচ্ছেন না। সংস্থাটি মনে করে, এখনো নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পরিবেশ নেই। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

নাৎসি কায়দায় গণহত্যা গাযায়: রাষ্ট্রসংঘ

ইসরাঈল কর্তৃক গাযায় সংঘটিত সহিংসতা ও মানবিক বিপর্যয়কে নাৎসিদের অত্যাচারের সঙ্গে তুলনা করেছেন রাষ্ট্রসংঘের ফিলিস্তীন বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদনকারী ফ্রান্সেস্কা আলবানেজ। তিনি বলেন, ‘একটি রাষ্ট্র যখন শিশুদের গুলি করে মারে, লক্ষাধিক মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে অনাহারে রাখে, তখন তা ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতাকে মনে করিয়ে দেয়। শুধু রাষ্ট্রসংঘ নয়, ইসরাঈলি সেনারাও গাযায় তাদের কার্যক্রমের তুলনা করেছেন নাৎসি বাহিনীর সঙ্গে। ইসরাঈলের প্রভাবশালী পত্রিকা হারেজৎ-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এক সেনা বলেন, ‘আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন নাৎসি সেনা, ওরা যেন ইয়াহূদী। আমরা যেমন আচরণ করছি, তা কোনো যুদ্ধনীতির সঙ্গে মেলে না’। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, গাযায় নির্বিচারে গোলাবর্ষণ, বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো এবং পুরো পাড়া-মহল্লা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে নির্দেশহীনভাবে। অনেক ক্ষেত্রেই ‘সন্দেহজনক’ এলাকা বলেই হাজার হাজার পরিবারকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে। ফ্রান্সেস্কা আলবানেজ বলেন, ‘আমাদের প্রজন্ম শিখেছিল, নাৎসিবাদ মানবতার সবচেয়ে জঘন্য অধ্যায়। আজ আমরা কীভাবে চোখ বন্ধ করে রাখি; যখন একটি জাতি একই ধরনের বর্বরতা চালায় অন্য এক জনগণের ওপর?’ রাষ্ট্রসংঘ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ একাধিকবার ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ এনেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ইতোমধ্যে ইসরাঈলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ও প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োআভ গ্যালান্ত, এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। কিন্তু তাতে গাযায় হামলার তীব্রতা কমেনি।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

কার্বন শোষণে সক্ষম ‘জীবন্ত জেলি’ তৈরি করলেন বিজ্ঞানীরা

সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা এক অভিনব পরিবেশবান্ধব আবিষ্কার করেছেন—সবুজ রঙের থকথকে এক ‘জীবন্ত জেলি’। দেখতে সাধারণ জেলের মতো হলেও, এর ক্ষমতা

অসাধারণ। গবেষকদের দাবি, এই জেলি বছরে প্রায় ১৮ কিলোগ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে সক্ষম। তুলনামূলকভাবে, একটি পূর্ণবয়স্ক পাইন গাছ বছরে ২০–৪০ কেজি কার্বন শোষণ করে। সেদিক থেকে দেখলে, এই ক্ষুদ্র জেলি একাই একটি গাছের সমান কাজ করতে পারে।

'নেচার কমিউনিকেশন' জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় জানানো হয়েছে, বিজ্ঞানীরা একধরনের প্রাচীন শৈবাল—সায়ানোব্যাক্টেরিয়া ব্যবহার করে এই জেলি তৈরি করেছেন। সায়ানোব্যাক্টেরিয়া সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে পানি, আলো ও বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন তৈরি করতে পারে, গাছের মতোই। তবে অণুজীবগুলোকে স্থির ও কার্যকর রাখতে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন হাইড্রোজেল নামের এক জেলির মতো পদার্থ। এই হাইড্রোজেলের মধ্যে সায়ানোব্যাক্টেরিয়া ঢুকিয়ে ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে নানা আকৃতির জীবন্ত জেলি। দেখতে সাধারণ হলেও, এর ভেতরে সায়ানোব্যাক্টেরিয়া সারাক্ষণ বাতাস বিশুদ্ধ করতে কাজ করে যাচ্ছে। এই জেলি ঘরের ভেতরে রাখলে বাতাস হবে আরও নির্মল। আবার শহরের মোড়ে, কারখানার আশেপাশে বা যানবাহনে ঠাসা এলাকায় ছড়িয়ে দিলে তা দূষণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই আবিষ্কার পরিবেশ রক্ষায় এক বড় সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা কর্মকাণ্ড—রান্না, গাড়ি চালানো, বিদ্যুৎ ব্যবহার ও শিল্পকারখানায়—যেভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়, তা থেকে সৃষ্ট 'কার্বন ফুটপ্রিন্ট' কমাতে এই জীবন্ত জেলি হতে পারে কার্যকর এক সহায়ক।

দাওয়াহ সংবাদ

'তিন দিনের মাদরাসা'- প্রথম ব্যাচের কোর্স সমাপ্ত

ডাঙ্গিপাড়া, রাজশাহী: জুলাই, ২০২৫ ইং: জেনারেল শিক্ষিত ভাই যারা দ্বীন শিখতে আগ্রহী; অথচ কর্মজীবনে ব্যস্ত এমন ভাইদের জন্য আরও একটি সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করল 'আদ-দাওয়া ইলাল্লহ'। সালাফী উলামা-শায়খদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে থেকে দ্বীন শিক্ষার এই প্লাটফর্ম 'তিন দিনের মাদরাসা' নামে পরিচিত। গত ৩রা জুলাই, ২০২৫ ইং থেকে ৫ই জুলাই, ২০২৫ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কর্মজীবনে ব্যস্ত জ্ঞানপিপাসু দ্বীনি ভাইয়েরা 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহীতে একত্রিত হয়ে ৩ দিন মেয়াদী বাংলাদেশের বিদগ্ধ উলামায়ে দ্বীনের সান্নিধ্যে থেকে হাতে-কলমে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান, আক্বীদা-আমল, আদব-তারবিয়াত শিখেন। শবগুজারীর মাধ্যমে ইবাদতে অভ্যস্ত হন। নির্দিষ্ট সিলেবাস ও রুটিন মাফিক কোর্সটি বিনামূল্যে তারা গ্রহণ করেন। কোর্সে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাতের তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করানো হয়। এতে ৩০ জন কর্মজীবী দ্বীনী ভাই অংশগ্রহণ করেন। 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর অধীন পরিচালিত 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ' এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সহ-সেক্রেটারি ও 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'-এর সম্মানিত পরিচালক-২ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর শিক্ষকবৃন্দ ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর দাঈগণ— আব্দুর রাযাযাক বিন ইউসুফ, মাহবুবুর রহমান মাদানী, আব্দুল আহাদ স্যার, হাসান আল-বান্নাহ মাদানী, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত কোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল ছালাতের প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ। এই সেশনে ইন্সট্রাক্টর ছিলেন মাহবুবুর রহমান মাদনী। রাতের তাহাজ্জুদ ছালাতে ইমামতি করেন হাফেয শহীদুল ইসলাম। এতে প্রশিক্ষণার্থীগণ স্বাচ্ছন্দ্যে অংশ নেন এবং ছালাত শিক্ষায় উপকৃত হন। প্রশিক্ষণটি বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব থেকে শুরু হয়ে শনিবার সকাল ১০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্বীনি ভাইদের দ্বীনি যিন্দেগী, সামাজ ও রাষ্ট্র গঠনের উপর উপদেশ প্রদান করেন। বৈঠক শেষের দু'আ পাঠের মাধ্যমে এই কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): জান্নাতুল ফিরদাউস পাওয়ার জন্য কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন?

উত্তর: সদাচরণের মাধ্যমে জান্নাতুল ফিরদাউস পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যিম্মাদার হব’ (আবূ দাঊদ, হা/৪৮০০)। এছাড়া যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে তা হলো- (১) মুমিন হওয়া, (২) ছালাতে খুশূখুযূ থাকা, (৩) অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলা, (৪) যাকাত দেওয়া, (৫) সচ্চরিত্রবান হওয়া, (৬) সীমালংঘনকারী গুনাহসমূহে লিপ্ত না হওয়া, (৭) নিজের জন্য বৈধ কেবল এমন মানুষের সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া, (৮) আমানত রক্ষা করা, (৯) ওয়াদা পূর্ণ করা, (১০) ছালাতে যত্নবান হওয়া, এই গুণগুলো যাদের মধ্যে থাকবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে, যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে’ (আল-মুমিনূন, ২৩/১-১১)। আর রাসূল ﷺ বলেন, ‘তোমরা আল্লাহর নিকট চাইলে ফিরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৯০)। উক্ত হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করে জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য এভাবে দু‘আ করা যায়- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ أَعْلَى الْجَنَّةَ ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সুউচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করি’।

প্রশ্ন (২): আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব কীভাবে?

উত্তর: মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যা উপভোগ করে বা গ্রহণ করে থাকে সবই আল্লাহর নেয়ামত। সেসব কিছুর শুকরিয়া আদায় করতে হবে অন্তরে, মুখে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। যেমন- আল্লাহর শুকরিয়ার জন্য মুখে আলহামদুলিল্লাহ বলা। মানষের শুকরিয়ার জন্য জাযাকাল্লাহ খায়র বলা। অন্যান্য নেয়ামত যেমন- খাবার খাওয়ার পর বা পোশাক পরিধানের পর দু‘আ পাঠ করা। খাবার খাওয়ার পর বলা, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ ‘সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে এটা আহার করিয়েছেন এবং এটা আমাকে রিযিক দিয়েছেন, আমার তা লাভ করার প্রচেষ্টা বা শক্তি ব্যতীত’ (সুনানু তিরমিযী, হা/৩৪৫৮)।

প্রশ্ন (৩): একজন মুসলিমের ওপর ন্যূনতম কতটুকু ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা ফরয? সেক্ষেত্রে কী কী বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে?

উত্তর: একজনের মুসলিমের উপর তাওহীদ, ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আবশ্যক। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত- এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল, ছালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ পালন করা এবং রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা’ (ছহীহ বুখারী, হা/৮)। হাদীছে জিবরীলে এসেছে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম প্রশ্ন করলেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলুন অর্থাৎ ইসলাম কী? উত্তরে তিনি ﷺ বললেন, ‘ইসলাম হচ্ছে তুমি সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, ছালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে; যদি সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে’। এরপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, ‘ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তাআলা, তাঁর মালায়িকা (ফেরেশতাগণ), তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এছাড়া তাক্বদীরের উপর অর্থাৎ জীবন ও জগতে কল্যাণ-অকল্যাণ যা কিছু ঘটছে, সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে এ কথার উপর বিশ্বাস করা’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৮)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যদি আমি তা করি; তবে জান্নাতে প্রবেশ করব। রাসূল ﷺ বললেন,

‘আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে অন্য কোনো কিছুকে শরীক করবে না, ফরয ছালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করবে’। সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তার শপথ করে বলছি! আমি এর চেয়ে বেশি করব না। যখন সে ফিরে গেল, নবী ﷺ বললেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে পছন্দ করে, সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৯৭)। এছাড়া যখন যে বিষয় প্রয়োজন হবে, তখন সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন (৪): ছোট গুনাহ বা সুন্নাত বাদ দিলে আল্লাহ রোগ দেন বা শাস্তি দেন এমন ধারণা কি সঠিক?

–এমতিয়াজ
মুগদা মদিনাবাগ, ঢাকা।

উত্তর: ছোট-বড় গুনাহের কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নেমে আসে; তখন গুনাহের কারণে বিপদাপদ, কষ্ট, পরীক্ষা বা শাস্তি আসতে পারে। রাসূল ﷺ বলেন, ‘আর তুমি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, কারণ গুনাহের মাধ্যমেই আল্লাহর ক্রোধ নাযিল হয়’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০৭৫)। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের যেসব বিপদ আসে, তা তোমাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল। আর তিনি বহু গুনাহ ক্ষমা করে দেন’ (আশ-শুআরা, ২৬/৩০)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৫): ইহরামে থাকা অবস্থায় ফোঁটায় ফোঁটায় পেশাব হওয়ায় আন্ডারওয়্যার ব্যবহার করা যাবে কি?

-জাকির হোসেন।

উত্তর: এক্ষেত্রে সেখানে সেলাইবিহীন আলাদা কাপড় ব্যবহার করতে পারে। কেননা পুরুষদের জন্য ইহরামে সেলাইযুক্ত পোশাক পরা নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ইহরাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কী ধরনের কাপড় পরতে আদেশ করেন? নবী ﷺ বললেন, ‘জামা, পায়জামা, পাগড়ি ও টুপি পরিধান করবে না’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৮৩৮)।

প্রশ্ন (৬): মহিলারা হায়েয (পিরিয়ড) চলাকালীন কুরআন শরীফ স্পর্শ করে পড়তে পারবে কি? আর মুখস্থ কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি-না? দলীলসহ সঠিক মত জানতে চাই।

–শাহিন আলম
লালমনিরহাট।

উত্তর: অপবিত্র অবস্থায়ও কুরআন স্পর্শ করে পড়া যাবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৩; সুবুলুস সালাম, ১/১০২, হা/৭২)। ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, (হায়েয অবস্থায়) আয়াত পাঠে কোনো দোষ নেই। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা জুনুবীর জন্য কুরআন পাঠে কোনো দোষ মনে করতেন না। নবী ﷺ সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন। উম্মু আতিয়্যা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, (ঈদেন দিন) হায়েয অবস্থায় মহিলাদের বাইরে নিয়ে আসার জন্য আমাদের বলা হতো, যাতে তারা পুরুষদের সাথে তাকবীর বলে ও দু‘আ করে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, হিরাক্লিয়াস (রোম সম্রাট) নবী ﷺ-এর পত্র চেয়ে নিলেন এবং তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল, ‘দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (আপনি বলুন!) হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি। কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রবরূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়; তবে বলুন, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম’। আত্বা রাহিমাহুল্লাহ জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হায়েয অবস্থায় কা‘বা তওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য আহকাম পালন করেছেন, কিন্তু ছালাত আদায় করেননি। হাকাম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি জুনুবী অবস্থায়ও যবেহ করে থাকি। অথচ আল্লাহর বাণী হলো, ‘তোমরা আহার করো না সে সব প্রাণী, যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩০৫)। উল্লেখ্য, ওযূ ছাড়া কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা যাবে না মর্মে ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ আয়াতটি পেশ করা হয়। কিন্তু আয়াতটি উক্ত অর্থে বলা হয়নি এবং তার পক্ষের দলীলও নয়। বিস্তারিত দেখুন- নায়লুল আওত্বার, শাওক্বানী, ২য় খণ্ড, ২৫৯-২৬৫

পৃ.; তামামুল মিন্নাহ, ১০৭ পৃ.।

প্রশ্ন (৭): ওযূর পর أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ **পড়ার সময় আকাশের দিকে শাহাদাত আঙুল তুলে বা আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়তে হবে, এটা কি ঠিক?**

উত্তর: ওযূর পর এই দু'আটি পড়ার সময় আকাশের দিকে তাকানোর ব্যাপারে বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে যেসব হাদীছে আসমানের দিকে তাকানোর কথা উল্লেখ আছে সেসব হাদীছের 'আসমানের দিকে তাকানো'র অংশটুকু যঈফ (ইরওয়াউল গালীল, ১/১৩৫)।

ছালাত

প্রশ্ন (৮): ফজরের ছালাত শেষ করতে গিয়ে যদি ছালাতের নিষিদ্ধ সময় শুরু হয়ে যায়, তাহলে কি ছালাত কবুল হবে?

উত্তর: হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূর্য উঠার পূর্বে ফজরের ছালাতের এক রাকআত পায়, সে ফজরের ছালাত পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার পূর্বে আছরের ছালাতের এক রাকআত পেল, সে আছরের ছালাত পেয়ে গেল' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৯)।

প্রশ্ন (৯): ছালাতে সাহু সিজদাহ দিতে ভুলে গেলে করণীয় কী? ছালাত কি বাতিল হয়ে যাবে?

উত্তর: যদি কেউ সিজদায়ে সাহু ছালাতের মধ্যে দিতে ভুলে যায়, এরপর ছালাতের পরপরই মনে পড়ে, তাহলে তা আদায় করে নেবে। তবে তখন স্মরণে না থাকলে পরবর্তীতে তা আর আদায় করা লাগবে না। তার ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে (আশ-শারহুল মুমতে, ৩/৩৯৭)।

প্রশ্ন (১০): মাঝেমধ্যে ঘুমের জন্য ফজর মিস হয়ে যায়। ঘুম থেকে ওঠার পরও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় ফজরের কাযা আদায় করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। এতে কি পরবর্তীতে পড়া ছালাত হবে?

উত্তর: স্মরণ হওয়া মাত্রই ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা এটা রাসূল ﷺ-এর আদেশ। বিলম্ব করলে পাপী হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যদি তোমাদের কেউ ছালাতের কথা ভুলে যায় বা ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে, সে যেন মনে পড়া মাত্রই (সেই ছালাত) পড়ে নেয়' (তিরমিযী, হা/১৭৭)।

প্রশ্ন (১১): সফরে থাকা অবস্থায় ছালাত কাযা হলে, ফিরে এসে তা আদায় করলে কি কছর হিসেবে পড়তে হবে, নাকি পূর্ণ ছালাত আদায় করতে হবে?

উত্তর: সফরে থাকা অবস্থায় ছালাত ছুটে যাবার পর যদি মুকীম অবস্থায় সেটা কাযা করা হয়, সেক্ষেত্রে সতর্কতাবশত পূর্ণ ছালাত আদায় করতে হবে, কছর করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সফরে থাকা অবস্থায় কারো যোহর কাযা হয়ে গেল, যা কছর হিসেবে দুই রাকআত পড়ার কথা। মুকীম অবস্থায় যখন এই ছালাতের কাযা আদায় করা হবে, তখন দুই রাকআতের স্থলে পূর্ণ চার রাকআত আদায় করতে হবে (আল-মুগনী, ৩/১৪২; আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব, ৪/৩৬৬)।

প্রশ্ন (১২): ফরয ছালাতের পর পড়ার তাসবীহগুলো কি সুন্নাত বা নফলের পরে পড়া যাবে?

উত্তর: একাধিক হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যিকিরগুলো ফরয ছালাতের পরই পড়তে হবে। তবে সুন্নাতের পরও পরা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্ত করা গোলাম ছাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ছালাত শেষ করতে চাইতেন, তখন তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ বলতেন। তারপর বলতেন, اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ 'হে আল্লাহ, তুমিই শান্তি আনায়নকারী। তোমার নিকট হতেই শান্তি আসে। হে পরাক্রম ও সম্মানের অধিকারী! তুমি বরকত ও প্রাচুর্যময়'। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছালাত থেকে ফারেগ হয়ে তিনবার ইস্তিগফার পড়তেন আর এই যিকিরটি পাঠ করতেন (তিরমিযী, হা/৩০০)।

প্রশ্ন (১৩): আমি গুরুতর অসুস্থ। গোসল করলে সমস্যা বেড়ে যায়, ডাক্তারও নিষেধ করেছেন। এই অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে আমি কীভাবে ছালাত আদায় করব?

–নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: কেউ যদি গুরুতর অসুস্থ হয়ে থাকে এবং ডাক্তার যদি নিশ্চিতভাবে বলে থাকেন যে, গোসল করলে তার

রোগের ক্ষতি হবে বা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে, তাহলে সে গোসল না করে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর যদি তোমরা অসুস্থ হও... এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো, তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নাও’ (আল-মায়েদা, ৫/৬)। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে বের হই। আমাদের একজনের মাথায় একটি পাথর আঘাত করে, ফলে তার মাথা ফেটে যায়। এরপর সে স্বপ্নদোষে অপবিত্র (জুনুব) হয়। সে তার সাথীদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি আমার জন্য তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে মনে কর? তারা বলল, তুমি যেহেতু পানি ব্যবহারে সক্ষম, তাই তোমার জন্য কোনো ছাড় নেই। সে গোসল করল, ফলে মারা গেল। আমরা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পৌঁছলে, তাকে এ ঘটনা জানানো হয়। তখন তিনি বললেন, ‘তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! তারা কেন জিজ্ঞেস করল না, যখন তা জানত না? অজ্ঞতার চিকিৎসা হলো প্রশ্ন করা। তার জন্য যথেষ্ট ছিল, সে তায়াম্মুম করে নিত এবং তার ক্ষতস্থানে কাপড় বেঁধে সেটির উপর মাসাহ করত এবং শরীরের বাকি অংশ ধুয়ে ফেলত’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৩৬; ইবনু মাজাহ, হা/৫৭২)।

প্রশ্ন (১৪): কারণবসত বা সফরে থাকাকালীন একাধিক ওয়াক্তের ছালাত কাযা হয়ে গেলে যাদের কাযা হয়েছে তাদের নিয়ে জামাআতের সাথে কাযা ছালাত আদায় করা যাবে কি?

–গোলাম জিলানী মাহবুবে আলম
পল্লবী, ঢাকা।

উত্তর: হ্যাঁ, কাযা ছালাত জামাআতে আদায় করা যায়। আবূ কাতাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমরা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, এমনকি সূর্য উঠেও যায়। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাগ্রত হয়ে বললেন, ‘নিদ্রার কারণে সময়মতো ছালাত না পড়া গুনাহ নয়; বরং গুনাহ তখনই হয়, যখন জেনেবুঝে দেরি করা হয়’। অতঃপর তিনি বেলালকে আযান দিতে বললেন এবং নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে জামাআতে ওই ছালাত পড়ালেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮১; ছহীহ বুখারী, হা/ ৫৯৬)।

প্রশ্ন (১৫): মসজিদে জামাআত চলাকালীন সময়ে কেউ আলাদা করে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হবে কি?

-মুরাদ মিয়া
রংপুর।

উত্তর: না, ফরয ছালাত চলাকালীন কোনো সুন্নাত পড়া যাবে না। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘ছালাতের ইকামত দেওয়া হলে ফরয ছালাত ছাড়া আর কোনো ছালাত নেই’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৭১০)। অতএব, ছালাতের ইকামত হয়ে গেলে সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিয়ে ফরয ছালাতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন (১৬): আমি আমাদের এক মসজিদে হানাফী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করি। উনি ছালাতে কোনো ভুল করলে হানাফী মাযহাবের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে প্রথমে সাহু সিজদায় তাশাহহুদ পড়া হয়। পরবর্তীতে দুইটি সিজদা দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে আবার তাশাহহুদ, দরূদ ও দু'আ মাছূরা পড়া হয়। এক্ষেত্রে আমাদের এই নিয়ম অনুসারে সাহু সিজদা দেওয়া কি ঠিক আছে কি? নাহলে আমি কীভাবে ইমামের পিছনে সাহু সিজদা দিব?

-মো. আলিন
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

উত্তর: হাদীছের ভাষ্যমতে ছালাতে ইমামের অনুসরণ আবশ্যক। সুতরাং যখন ইমাম সিজদায়ে সাহু আদায় করবে, তখন মুক্তাদীও তা আদায় করবে। এক্ষেত্রে ইমাম যদি ফিকহে হানাফীর পদ্ধতি অনুযায়ী সিজদায়ে সাহু আদায় করে, তাহলে মুক্তাদীও সেভাবে আদায় করবে। কারণ হাদীছে ইমামের বিরোধিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/৭২২)।

প্রশ্ন (১৭): জুমআর খুৎবা শুনা কি ওয়াজিব? মসজিদে প্রবেশ করে আগে তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছালাত পড়া উচিত নাকি সরাসরি বসে খুৎবা শোনা উচিত?

–কবিরুল ফরাজী
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: হ্যাঁ, জুমআর খুৎবা মনোযোগ সহকারে শোনা ওয়াজিব। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ‘জুমআর দিন

ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন এমন সময় যদি তুমি তোমার পাশে থাকা ব্যক্তিকে বল, তুমি চুপ থাকো, তাহলে তুমি অনর্থক কাজ করলে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫১; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৬৭২)। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, খুৎবার সময় নীবরে মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শোনা জরুরী। আর অন্য কাউকে চুপ থাকতে বলাও নিষেধ। ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন এমতাস্থায় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে আগে দুই রাকআত সুন্নাহ আদায় করবে তারপর বসবে। সুন্নাহ আদায় না করে খুৎবা শ্রবণ করা সুন্নাহ বিরোধী কাজ। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলায়ক আল-গাত্বফানী জুমআর দিন আসল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা দিচ্ছিলেন। এসেই তিনি বসে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'উঠো, সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকআত ছালাত আদায় করো'। তারপর তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের কেউ যদি খুৎবা চলাকালীন সময় জুমআয় উপস্থিত সে যেন সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকআত ছালাত আদায় করে নেয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৪০৫)।

প্রশ্ন (১৮): মুক্তাদী কি ইমামের সাথে সাথেই সালাম ফিরাবে নাকি একটু দেরি করে সালাম ফিরাবে?

উত্তর: মুক্তাদী ছালাতের আমলগুলো ইমামের সাথে সাথে না করে পরে করবে (আল-মুগনী, ২/২০৮)। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সে (ইমাম) রুকূতে যাবার পর তোমরা রুকূ করো, সে (রুকূ থেকে) ওঠার পর তোমরা উঠো' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৮)। ছাহাবীরাও এভাবেই আমল করতেন। বারা বিন আযিব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, তারা (অর্থাৎ ছাহাবীরা) যতক্ষণ না দেখতেন যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যমিনে স্বীয় মুখমণ্ডল স্থাপন করেছেন, ততক্ষণ তারা দাঁড়ানো অবস্থাতেই থাকতেন। এরপর তাঁর অনুসরণ করতেন (অর্থাৎ সিজদায় যেতেন) (সিলসিলা ছহীহাহ, হা/২৬১৬)। কাজেই ইমাম দুই দিকে সালাম ফেরানো শেষ করলে মুক্তাদী সালাম ফেরানো শুরু করবে (কাশশাফুল ক্বিনা, ১/৪৬৫)।

প্রশ্ন (১৯): আমি পাশের মসজিদ বাদ দিয়ে খুৎবা ভালোভাবে শোনার জন্য দূরের মসজিদে যানবাহনে জুমআ পড়তে যাই। এতে কি পাশের মসজিদের হক্ব নষ্ট হয়? আর যানবাহনে যাওয়ায় পায়ে হাঁটার ছওয়াব থেকে কি বঞ্চিত হব?

–মো. তাহেনুর রহমান
নয়নপুর, সদর, দিনাজপুর।

উত্তর: দূরের মসজিদে বৈধ কারণে জুমআর ছালাত আদায়ের জন্য যাওয়া যায়। এতে পাশের মসজিদের হক্ব নষ্ট হবে না। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এশার ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর নিজের গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ওই ছালাত (এশা) পড়াতেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৬১০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৬৫)। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, পাশের মসজিদ রেখে দূরের কোনো মসজিদে যাওয়া যায়। আর পায়ে হাঁটার হুবহু নেকী সে পাবে না। তবে ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে থাকায় জ্ঞান অর্জনের নেকী পাবে।

প্রশ্ন (২০): ওয়াক্ত হয়ে গেলে আযান দেওয়ার আগেই কি ছালাত আদায় করা যাবে?

উত্তর: যদি কারো ওযর থাকে কিংবা কোনো নারী যদি ওয়াক্তের শুরুতেই ছালাত আদায় করে নিতে চান, সেক্ষেত্রে ওয়াক্ত হয়েছে জানা গেলে আযান দেওয়ার আগেও ছালাত আদায় করা যায়। কেননা ছালাত আদায়ের শর্ত্ত হচ্ছে ওয়াক্ত হওয়া, আযান দেওয়া নয় (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব, ৭/৭৩)।

প্রশ্ন (২১): ফোনে বা কারো কাছ থেকে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত শুনলে, শ্রোতাদের কি সিজদা দেওয়া ওয়াজিব?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি তিলাওয়াত করুক বা শুনুক তিলাওয়াতে সিজদা সুন্নাত। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজমের মধ্যে সিজদা করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মুসলিম, মুশরিক, জিন ও মানব সবাই সিজদা করল (ছহীহ বুখারী, হা/১০৭১)। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, হে লোক সকল! আমরা যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করি, তখন যে সিজদা করবে সে ঠিকই করবে, যে সিজদা করবে না তার কোনো গুনাহ নেই। তার বর্ণনায়, (বর্ণনাকারী বলেন) আর উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু সিজদা করেননি (ছহীহ বুখারী, হা/১০৭৭)।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (২২): মানুষ যে ‘জুম্মা মোবারক’ বলে শুক্রবারে শুভেচ্ছা জানায়, এটা কি জায়েয?

উত্তর: এটা বলা যাবে না। এর কোনো শারঈ ভিত্তি নেই। বরং নেকীর আশায় বলা হলে তা বিদআত আর সামাজিকভাবে বললে তা কুসংস্কার (মাজাল্লাতুল বুহূছিল ইসলামিয়্যাহ, ৯০/৬০)।

প্রশ্ন (২৩): আমাদের একাডেমিক এসাইনমেন্ট বা প্র্যাক্টিক্যাল থাকে, এটা অনেকে কিনে জমা দেয় বা অন্যদের থেকে করিয়ে নিয়ে জমা দেয়। সেটা কি জায়েয হবে? বিশেষত সেটা যদি কেবল ছবি আঁকা হয়।

উত্তর: না, জায়েয হবে না। এগুলো সবই প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটা তাকেই পূরণ করতে হবে। নিজের ওপর আরোপিত কাজ বিনা অনুমতিতে অপরকে দিয়ে করানো প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা, যা শরীআহ বৈধ করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে প্রতারণা করে, সে আমার কেউ নয়’ (ছহীহ মুসলিম, হা/ ১০২)।

প্রশ্ন (২৪): পশু-প্রাণীর ছবি আঁকা পাপ, কিন্তু আমাদের একাডেমিক প্র্যাক্টিক্যাল খাতায় অনেক সময় বাধ্য হয়ে পশু-প্রাণীর ছবি আঁকতে হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কী? বাধ্য হয়ে করলে কি আমরা গুনাহগার হব?

উত্তর: পশু-প্রাণীর ছবি আঁকা অনেক বড় পাপ। এ মর্মে রাসূল ﷺ বলেন, ‘কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি প্রদান করা হবে ছবি অঙ্কনকারীদের’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০)। অন্য হাদীছে এসেছে, ‘যে পৃথিবীতে কোনো ছবি অঙ্কন করবে তাকে কিয়ামতের দিন তার রূহ দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করা হবে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২১১০)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘এই ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে, যা তুমি সৃষ্টি করেছ তার প্রাণ দাও’ এবং তিনি আরও বলেন, ‘যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮০৭)। তবে যদি কেউ নিরুপায় হয়ে আঁকে, তাহলে গুনাহগার হবে না, ইনশা-আল্লাহ।

প্রশ্ন (২৫): ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রি করা যাবে কি?

-শোয়াইব আহমেদ
খালিহাটি, টাঙ্গাইল।

উত্তর: এসব স্যাম্পল বিক্রি করা তো বহু দূরের কথা এগুলো ডাক্তারদেরকে দেওয়া বা নেওয়া ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। কোনো স্যাম্পল দেওয়া বা নেওয়া উভয়ই বৈধ নয়। এতে সরাসরি ঘুষ রয়েছে। বুরায়দা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ‘আমরা কাউকে সরকারি পদে নিযুক্ত করলে তার আহারের ব্যবস্থাও আমার দায়িত্ব। পরে সে অতিরিক্ত কিছু নিলে, তবে তা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য হবে’ (আবূ দাঊদ, হা/২৯৪৩)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ‘কর্মচারীদের উপহার গ্রহণ করা খেয়ানত’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩২)। নবী ﷺ বলেন, لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ‘আল্লাহ তাআলা ঘুষদাতা ও গ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০)।

প্রশ্ন (২৬): বর্তমানে অনেক ই-কমার্স ব্যবসায়ী ড্রপশিপিং পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রি করে অর্থাৎ পণ্য নিজের হস্তগত না করেই কাস্টমারের অর্ডার অনুযায়ী ডিলার থেকে নিয়ে পৌঁছে দেয়। আমি নিজেও পণ্য স্টক করে বিক্রি করি, তবে স্টক শেষ হয়ে গেলে মাঝে মাঝে অর্ডার পাওয়ার পর ডিলার থেকে এনে দিই, কখনও কাস্টমারকে জানিয়ে, কখনও না জানিয়ে। এই পদ্ধতি কি শরীআতসম্মত?

–মুহাম্মাদ রাইহানুল করিম
চট্টগ্রাম।

উত্তর: যেসব পণ্যে ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানা থাকবে, যখন ইচ্ছা সে তা বিক্রি করতে বা নিজের কাছে রেখে দিতে পারবে, সেসব পণ্য নিজের আয়ত্বে না নিয়ে আসলেও বিক্রি করতে পারে; যদি পণ্যটি বৈধ হয় এবং তাতে কোনো প্রতারণা না থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘কোনো ব্যক্তি এমন বস্তু বিক্রয় করতে পারবে না, যার সে মালিক নয়’ (নাসাঈ, হা/৪৬১২)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘তোমার কাছে নেই, এমন জিনিস বিক্রি করো না’ (তিরমিযী, হা/১২৩২)।

প্রশ্ন (২৭): আকীকার জন্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা যাবে কি? নাকি বাড়ি বাড়ি গোশত বিতরণ করাই উত্তম? অনুষ্ঠানের উপহার গ্রহণ করা যাবে কি?

-মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : আকীকার গোশত ব্যক্তির নিজস্ব গোশত। তা রান্না করে নিজে খাওয়া এবং আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও মিসকীনদেরকে খাওয়াতে পারে বা কাঁচা গোশতও বিতরণ করতে পারে। আকীকাকে কেন্দ্র করে আনুষ্ঠানিকতার কোনো দলীল কুরআন ও হাদীছে পাওয়া যায় না। তবে কেউ করতে চাইলে সেটা লৌকিকতা ও আড়ম্বরমুক্ত হতে হবে। আগত মেহমানগণ থেকে কোনো হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে না (মুসনাদে আহমাদ, হা/২১০৮২; আল-মুগনী, ৯/৪৬৩)।

প্রশ্ন (২৮): আমাদের মসজিদের নাম 'খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া জামে মসজিদ'। সেখানে মসজিদের পাশেই পীরের কবর আছে। খানকার নাম, তরীকার প্রচার ও কবর সামনে রেখে ছালাত আদায় করা কি জায়েয?

-মো. সোহেল রানা
ঢাকা।

উত্তর: খানকাহ শব্দটি আরবী থেকে আসা, ধর্মের সাথে এ শব্দের দূরতম কোনো সম্পর্ক নাই। এটি কোনো আরবী শব্দ নয়। এটি ফারসী শব্দ, যার অর্থ হলো, খানকাহ (خانقاه)= 'খান' (خان)= ঘর বা আবাস (ফার্সি)। 'গাহ/কাহ' (گاه/قاه)= স্থান বা জায়গা (ফার্সি)। সুতরাং 'খানকা' মানে বসবাসের জায়গা। খানকার নামে পীরপূজা, কবরপূজা ও শিরক-বিদআতের মতো বড় বড় শরীআত বিরোধী কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর কবরকে সামনে, পিছনে, ডানে বা বামে রেখে ছালাত আদায় করা যাবে না। আবূ মারছাদ আল-গানাভী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের উপর ছালাত আদায় করো না' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭২৫৫)। আবূ মারছাদ আল-গানাভী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরকে সামনে করে ছালাত আদায় করো না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭২; মিশকাত, হা/১৬৯৮)। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/১৬৯৮, ২৩১৫, ২৩২২ 'সনদ ছহীহ')। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেন, কবর কিবলার সামনে, পিছনে, ডানে বা বামে যেদিকেই থাক না কেন ছালাত হবে না (আস-সামারুল মুস্তাত্বাবু ফী ফিকহিস্ সুন্নাহ ওয়াল কিতাব, পৃ. ৩৫৭)। এসব তরীকার কোনো প্রকার প্রচার-প্রসার করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৯): অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা ইএমআই (EMI)-তে পণ্য বিক্রি করে এবং নির্ধারিত সময়ের পর পেমেন্ট হলে অতিরিক্ত চার্জ নেয়। এধরনের শর্তে অতিরিক্ত চার্জ বৈধ হবে কী? এবং এধরনের প্রতিষ্ঠানে কালেকশন অফিসার হিসেবে চাকরি করা যাবে কি?

-মহিউদ্দিন
চাপাপুর, কুমিল্লা।

উত্তর: ১. পণ্যের মূল্য নির্ধারিত সময়ের পর পরিশোধ করার কারণে যে অতিরিক্ত চার্জ ধার্য করা হয়, তা সূদের আওতাভুক্ত (আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, ২/১৮৬)। আল্লাহ তাআলা সূদকে হারাম ঘোষণা করেছেন (আল-বাকারা, ২/২৭৫)। ২. প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানে কালেকশন অফিসার পদে চাকরি করা এবং এর উপার্জন হালাল হবে না। কারণ- ক. রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদগ্রহীতা, সূদদাতা, সূদ সম্পর্কিত লেনদেনের লেখক ও সাক্ষীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, 'এরা সমপর্যায়ের' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। খ. ইএমআই এর অধিকাংশ কার্যক্রম সূদের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এর মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করা হারাম কাজে সহযোগিতা করার শামিল। আল্লাহ তাআলা গুনাহের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩০): আমি একটি কোম্পানির হিসাবরক্ষক। চাকরির কারণে সূদ, ঘুষ ও ভ্যাট ফাঁকি ইত্যাদিতে জড়াতে হয়। এ অবস্থায় চাকরি চালিয়ে যাওয়া কি ইসলামী দৃষ্টিতে জায়েয?

-আব্দুল্লাহ মুরাদ
জামালপুর সদর।

উত্তর: এ সকল কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসা সম্ভব হলে চাকরি করা যাবে, নচেৎ যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন' (আল-বাকারা, ২/২৭৫)। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপর লা'নত করেছেন (মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৮৩; সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/২৩১৩)। সুতরাং ফিরে আসা সম্ভব না হলে হালাল বিজনেস বা অন্য কোনো হালাল উপায়ে উপার্জন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন ছালাত আদায় শেষ হবে, তখন তোমরা যমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর রিযিক তালাশ করো' (আল-জুমুআহ, ৬২/১০)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩১): সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে ইনকাম হালাল হবে কি?

-ইমতিয়াজ
মুগদা মদিনাবাগ, ঢাকা।

উত্তর: সহশিক্ষা ও পর্দাহীন পরিবেশে চাকরি করা ও অর্থ উপার্জন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি এমন হয়, যেখানে ইসলামী শরীআত পরিপন্থী কার্যক্রম হয়। যেমন- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, পর্দাহীনতা বা উদ্ভট পোশাকে চলা, ফেতনার আশঙ্কা স্পষ্ট অথবা নিজে গুনাহে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সেখানে চাকরি করা নাজায়েয। মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে' (আন-নূর, ২৪/৩০)। আর সরাসরি বা পরোক্ষভাবে হারাম কোনো কাজে সহায়তা করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরের সহযোগিতা করো না... (আল-মায়েদা, ৫/২)। তাই এমন প্রতিষ্ঠানে অর্থ উপার্জন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩২): যদি ইন্সটলমেন্টে সূদ (APR) যোগ হয় বা Renting Cost নামে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয়, তাহলে শরীআতের দৃষ্টিতে তা হালাল হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
অন্টারিও, কানাডা।

উত্তর: না, হালাল হবে না; বরং সেটা সূদ হবে। যদি কিস্তিতে শর্ত থাকে যে, নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। যেমন- এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করলে ১০০ টাকা এবং দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করলে ১২০ টাকা ইত্যাদি। অথবা যদি বলা হয়, নগদে ১০,০০০ টাকা, কিন্তু আপনি কিস্তিতে কিনলে ১০% সূদ যুক্ত হবে; তাহলে সেটা সূদ হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই বিক্রির মধ্যে দুই রকমের বিক্রি হতে নিষেধ করেছেন (মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/২৪৪৪; তিরমিযী, হা/১২৩১)।

প্রশ্ন (৩৩): আমি ভারতের বাসিন্দা। GST (Goods and Services Tax) রেজিস্ট্রেশনে দোকান দেখাতে গিয়ে ১০% মিথ্যা তথ্য দিতে হয়েছে, যদিও ব্যবসা ও পণ্য হালাল। এতে কি ইনকাম হারাম হবে নাকি শুধু মিথ্যার জন্য গুনাহ হবে?

-বুবাই
ভারত।

উত্তর: মিথ্যা বলা হারাম এবং কাবীরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো' (আল-হাজ্জ, ২২/৩০)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় মিথ্যা পাপের পথ দেখায় আর পাপ দেখায় জাহান্নামের পথ' (ছহীহ বুখারী, হা/৬০৯৪)। সুতরাং মিথ্যায় অভ্যস্ত হওয়া যাবে না। তওবা করে ফিরে আসতে হবে। অন্যথায় এই অভ্যাস জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। পণ্য ও ব্যবসা হালাল হলে উপার্জনও হালাল হবে। কারণ এর ভিত্তি হালাল। পক্ষান্তরে যদি শুধু মিথ্যার উপর ভিত্তি করেই উপার্জন হয়, তাহলে তা হালাল হবে না (আল-মুগনী, ৫/৪০৩)।

প্রশ্ন (৩৪): আমি একজন শিক্ষক। পেশাগত কারণে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েকে একত্রে পড়াতে হয়, বিভিন্ন এসেম্বলি বা অনুষ্ঠানে নাচ-গান হয় সেখানেও থাকতে হয়, এতে আমার উপার্জন কি হালাল হবে? এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

-তোহিদুজ্জামান
রংপুর।

উত্তর: শিক্ষাদান একটি বৈধ এবং ভালো কাজ। সুতরাং এর ভিত্তিতে যে উপার্জন আসবে তা হালাল হবে (আল-মুগনী, ৫/৪০৩)। কিন্তু সহশিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং নাচ-গানের

আয়োজন ইসলামের দৃষ্টিতে নাজায়েয। সহশিক্ষা ব্যবস্থার কারণে আমাদের সমাজে যেসব হারাম কাজের দ্বার উন্মোচিত হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা প্রায় সবাই অবগত। এজন্য করণীয় হলো এমন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার চেষ্টা করা যেখানে এই সমস্যাগুলো থাকবে না। আর সহশিক্ষা ও পর্দাহীন পরিবেশে চাকরি করা ও অর্থ উপার্জন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা এতে অন্যায়ের সহযোগিতা করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরের সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩৫): বেনামাযীর যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া কি হালাল?

-মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগ করে এবং ছালাতের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফির সাব্যস্ত হবে। ফলে তার যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল হবে না। আর যদি সে ছালাতের ফরয হওয়াকে স্বীকার করে; কিন্তু অসলতা বা অগ্রহণযোগ্য কোনো কারণে ছালাত পরিত্যাগ করে, তাহলে যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যায়; যদি সে যবেহের সময় বিসমিল্লাহ বলে (তাফসীর ইবনু কাছীর, ৩/৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৮২; আল-মিনহাজ, ২/৭১-৭২)।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৩৬): ইসলামে দুধ সম্পর্ক সাব্যস্তের নিয়ম কী? একবার ৪/৫ মিনিটের জন্য দুধ খেলে কি দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে?

উত্তর: দুধ সম্পর্ক সাব্যস্ত হতে ২ টি শর্ত রয়েছে- (১) দুধ পাঁচ চোষণ পান করতে হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৫২)। পাঁচ চোষণের কম যেমন এক বা দুই চোষণ পান করার মাধ্যমে দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'এক বা দুই চোষণ/চুমুক (সম্পর্ক) হারাম করে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৫০)। (২) এই দুধপান দুই বছর বয়সের মধ্যে হতে হবে (আল-বাকারা, ২/২৩৩)। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, দুই বছর সময়কালের বাইরে দুধপানের সম্পর্ক হবে না (দারাকুত্বনী, হা/৪৩৬৫)।

প্রশ্ন (৩৭): রাগের সময় স্ত্রীকে বলেছি, 'যাহ তুই তালাক', তার এক সেকেন্ডের মধ্যে বলি, 'তোরে আমি তালাক দিব'— এতে কি তালাক পতিত হয়েছে?

–নাঈমুর রহমান
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর: 'তুই তালাক' বলার সাথে সাথে এক তালাক হয়ে গেছে। কারণ এখানে তালাক শব্দটি স্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ। তাই নিয়্যত কী করল আর করল না সেটা ধর্তব্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তিনটি বিষয় এমন আছে যেগুলোর মজাকেও বাস্তব বলে গণ্য করা হয়- ১. বিয়ে ২. তালাক ও ৩. রাজআত' (সুনানে আবী দাঊদ, হা/২১৯৪)। পরে বলা, 'আমি তোমাকে তালাক দিব'- এ বাক্যের কোনো প্রভাব এখানে নেই। তাই ব্যক্তি যদি আগে কোনোদিন তালাক না দিয়ে থাকে, তাহলে এটাই হবে তার প্রথম তালাক এবং এক তালাকে রাজঈ। অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে তিন মাস অতিক্রম করার পূর্বেই তাকে নতুন করে বিবাহ ছাড়াই ফেরত নিতে পারবে। আর তিন মাস অতিক্রম হলে নতুন করে বিবাহ করে নিতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের স্বামীরা তাদের ইদ্দতের মধ্যে ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে, যদি তারা মীমাংসা করতে চায়' (আল-বাকারা, ২/২৮)। তাবেঈ হাসান বাছরী বলেন, 'ফালা তা'যুলু হুন্না' এ আয়াত নাযিলের ব্যাপারে মা'কাল ইবনু ইয়াসার বলেন, এটা এ ঘটনার ভিত্তিতে নাযিল হয়, আমার বোনকে কোনো এক লোকের সাথে বিবাহ দেই। সে তাকে তালাক প্রদান করে। তার ইদ্দত শেষ হলে সে তার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে। আমি তাকে বলি, আমি আমার বোনকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে তোমার বিছানাসঙ্গী করি, তোমাকে সম্মানিত করি আর তুমি তাকে তালাক দিলে। আবার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছ! না, সে তোমার কাছে যাবে না। আর লোকটি দেখতে শুনতে ভালো ছিল। আর মেয়েটিও তার কাছে যেতে চাচ্ছিল। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন, 'তোমরা যদি স্ত্রীদের তালাক দাও, অতঃপর তারা তাদের নির্ধারিত সময় পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে স্বামীদের বিবাহ

করতে বাধা প্রদান করো না, যদি তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে পরস্পর সম্মত থাকে' (আল-বাকারা, ২/২৩২)।

প্রশ্ন (৩৮): যখন কোনো নারী তার স্বামীকে বলে, তোমার থেকে ভালো কিছু কখনও দেখিনি (বা এই জাতীয় অসন্তোষজনক কথা, যেমন- আমি দেখে তোমার সংসার করলাম। তোমার সংসারে এসে কখনো সুখ পাইনি ইত্যাদি) তার অন্যান্য সকল নেক আমলের ছওয়াব বরবাদ হয়ে যায়। এই হাদীছ কি ছহীহ?

উত্তর: এটি ইমাম ইবনু আসাকীর (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাটি জাল (সিলসিলা যঈফাহ, হা/১৬৩২)। তবে আমভাবে স্ত্রী অকৃতজ্ঞ হলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাহান্নামী বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের বেশির ভাগই নারী; (কারণ) তারা কুফরী করে'। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে? তিনি বললেন, 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং অকৃতজ্ঞ হয়। তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, আমি কখনোই তোমার নিকট হতে ভালো কিছু পাইনি' (ছহীহ বুখারী, হা/২৯)। তাই নারীদের কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর বাধ্য থাকা, তার সাথে সদাচরণ করা এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

প্রশ্ন (৩৯): এক দ্বীনদার মেয়ে দ্বীনদার ছেলেকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু তার বাবা-মা অর্থসম্পদ দেখে দ্বীনহীন ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চান। মেয়েটি রাজি নয়। এক্ষেত্রে মেয়ের করণীয় কী?

– মো. এনামুর রহমান
সাতক্ষীরা।

উত্তর: উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে অভিভাবকদের কর্তব্য হলো কন্যা বিবাহ দিয়ে দেওয়া। নয়তো যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি হবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কাছে এমন কারো বিবাহের প্রস্তাব আসে, যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তা না কর, তবে পৃথিবীতে বড় ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি হবে' (তিরমিযী হা/১০৮৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৯৬৭)। বিবাহের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেয়ের অনুমতি নিতে বলেছেন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কুমারী নারী বিয়ে দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অনুমতি গ্রহণ করা হবে। আর বিধবা নারী বিয়ে দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মত গ্রহণ করা হবে (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৬৭)। মেয়ে কোনো দ্বীনদার পুরুষকে বিবাহ করতে চাইলে আর পিতামাতার এতে অসম্মতি থাকলে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে, নিজে বা কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে দিয়ে বুঝাবে।

প্রশ্ন (৪০): মাযারপূজারী কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখা কি জরুরী?

–ফিরোজ কবীর
নওগাঁ সদর, নওগাঁ।

উত্তর: হ্যাঁ, আত্মীয় মুশরিক (যেমন- মাযারপূজারী) হলেও, তাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামী শরীআতে জরুরী। তবে তার শিরক বা বিদআতের সমর্থন করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো' (আন-নিসা, ৪/১)। আসমা বিনতু আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ফতওয়া চেয়ে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করো' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬২০)।

উত্তরাধিকার বিধান

প্রশ্ন (৪১): সন্তানের জন্য কি সম্পদ রেখে যাওয়া আবশ্যক?

উত্তর: ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটাই যে, মানুষ তার পরবর্তী বংশধরের জন্য সম্পদ রেখে যাবে, যার বণ্টন পদ্ধতি কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সন্তানদের জন্য অর্থসম্পদ রেখে যাওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন, তুমি তোমার

ওয়ারিছদের এমন অবস্থায় রেখে যাবে যে, তারা দরিদ্র হয়ে মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়াবে; এর চেয়ে এটাই উত্তম যে, তুমি তাদেরকে ধনী ও অমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৮)।

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪২): পাগড়ি পরে ছালাত আদায় করলে ৭০ গুণ ছওয়াব পাওয়া যায় এ বিষয়ক হাদীছ কি সঠিক?

উত্তর: একটি বর্ণনায় এসেছে, 'পাগড়িসহ এক রাকআত পাগড়িবিহীন ৭০ রাকআতের চেয়েও উত্তম' (আল-জামিউছ ছগীর, হা/৬৮৭৪)। উক্ত বর্ণনা এবং এ মর্মে বর্ণিত সব হাদীছ জাল (সিলসিলা যঈফাহ, ১/২৫১)। মূলত পাগড়ি ছালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও পাগড়ি পরতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/ ১৩৫৯)। কাজেই তাঁর অনুসরণে কেউ যদি পাগড়ি পরে ছালাত আদায় করে, সেটা অবশ্যই উত্তম আমল, যদিও আলাদাভাবে ঠিক এই আমলটা করলে এত এত ছওয়াব মিলবে এমন সুস্পষ্ট বর্ণনা বিশুদ্ধ সনদে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৪৩): হাদীছে আছে, যে ব্যক্তির অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে যাবে না। কিন্তু যার অন্তরে ঈমান এবং অহংকার দুটোই আছে তার কী হবে? যেটা বেশি থাকবে সে অনুযায়ী ফায়সালা হবে কি?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যার অন্তর সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না আর যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না' (তিরমিযী, হা/১৯৯৮)। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, অহংকার একটি কাবীরা গুনাহ। এটা কখনো শিরকও হয়। যেমন- ইবলীস যে অহংকার করেছিল তা শিরক ছিল। যদি বান্দার অন্তরে অহংকার থাকে, সে নিঃসন্দেহে কাবীরা গুনাহ করছে আর কাবীরা গুনাহের বিধান হচ্ছে হয় আল্লাহ তা মাফ করে দিবেন, নয়তো এর জন্য সাজা দেবেন। ব্যক্তির ঈমান থাকলে সাজা দেওয়ার পর তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এজন্য এই হাদীছের ১ম অংশের অর্থ হচ্ছে কারও অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার থাকলেও সে সরাসরি জান্নাতে যেতে পারবে না, কেননা সে গুনাহগার। আর ২য় অংশের অর্থ হচ্ছে কারও অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান থাকলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। একদিন না একদিন সে পাপমুক্তির পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে সে ব্যক্তি যদি তওবা করে এবং তার তওবা কবুল হয়, তাহলে সে সরাসরি জান্নাতে যাবে। (আল-হাওয়াশী আলা সুনানি ইবনি মাজাহ, ৫/১২৭)।

প্রশ্ন (৪৪): যে আমলগুলোর (যেমন- হজ্জ) ব্যাপারে বলা হয়েছে মানুষকে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো নিষ্পাপ করে দেয়, সেগুলো কি কাবীরা গুনাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?

উত্তর: ঋণ ও মানুষের হক্ব ব্যতীত বাকি সব পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া ঋণ ব্যতীত সকল বিষয়ে ক্ষমা করিয়ে দেয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৮৬)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা কি বলতে পার, অভাবী লোক কে?' তারা বললেন, আমাদের মাঝে যার দিরহাম ও ধন-সম্পদ নেই সে তো অভাবী লোক। তখন তিনি বললেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সে প্রকৃত অভাবী লোক, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ছালাত, ছওম ও যাকাত নিয়ে আসবে; অথচ সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ ভোগ করেছে, অমুককে হত্যা করেছে ও আরেকজনকে প্রহার করেছে। এরপর সে ব্যক্তিকে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, অমুককে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর যদি পাওনাদারের হক্ব তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না যায় সে ঋণের পরিবর্তে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮১)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৫): বসে ও দাঁড়িয়ে পানি পান করার শরঈ বিধান কী?

উত্তর: বসে পানি পান করা সুন্নাত। তবে দাঁড়িয়েও পানি

পান করা যায়। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানায় আমরা হাঁটতে হাঁটতে খাবার খেতাম এবং দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় পানি পান করতাম (তিরমিযী, হা/১৮৮০)। আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। তখন লোকেরা তাঁর দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন তারা বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করছে। তিনি বললেন, তোমরা কী দেখছ? যদি আমি দাঁড়িয়ে পান করি, আমি তো নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখেছি। আর যদি আমি বসে পান করি, আমি তো নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বসে পান করতেও দেখেছি (মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৯৫)।

প্রশ্ন (৪৬): সময়ের বরকত চাওয়ার জন্য কি দুআ পড়া যায়?

উত্তর: এ ব্যাপারে খাছ কোনো দু'আ নেই। তবে ব্যাপক অর্থপূর্ণ দু'আ হিসেবে সময়ের বরকত চাওয়ার নিয়্যতে ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ এই দু'আ পড়তে পারে। এছাড়া নিজ ভাষাতেও দু'আ করতে পারে।

প্রশ্ন (৪৭): অনেকে এসে বলেন যে, অমুক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন, তখন কীভাবে এই সালামের উত্তর দিব?

উত্তর: এমন ক্ষেত্রে সালাম বাহক ও যিনি সালাম পাঠিয়েছেন উভয়কেই সালামের জবাব দেওয়া হবে এভাবে, عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ 'আপনার ওপর এবং তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৮৫৭)।

প্রশ্ন (৪৮): ছাত্রজীবনে কিছু শিক্ষক ও ভাইয়ের পাওনা টাকা পরিশোধ করিনি। অনেককে এখন খুঁজে পাই না বা মারা গেছেন। এ ঋণ কীভাবে আদায় করব?

-জাকারিয়া বিন মোবারক
হলদিঘর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: ঋণ (ধার) আদায় করা জরুরী। যদি পাওনাদার বেঁচে থাকে, তবে তাকে খুঁজে বের করে ফেরত দিতে হবে। যদি মারা যান, তবে তার ওয়ারিছকে দিতে হবে। আর যদি কাউকে খুঁজে পাওয়াই অসম্ভব হয়, তবে তার পক্ষ থেকে ছাদাকা করে দিতে হবে এই নিয়্যতে যে, এটাই তার হক্ব আদায়ের মাধ্যম হোক। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ঈমানদারের আত্মা তার ঋণের কারণে আটকে থাকে, যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা হয়' (তিরমিযী, হা/১০৭৮)।

প্রশ্ন (৪৯): মৃতব্যক্তির মুখমণ্ডল দেখলে কি ছওয়াব হয়?

ডা. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দিন
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

উত্তর : মৃতব্যক্তির মুখমণ্ডল দেখলে নির্দিষ্ট পরিমাণ বা নির্দিষ্ট ধরনের ছওয়াব হাছিল হয় মর্মে বর্ণিত কুরআনুল কারীমের কোনো আয়াত বা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো হাদীছ সম্পর্কে আমরা অবগত নই। তবে জামে তিরমিযীতে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, উছমান বিন মাযঊন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ইন্তিকাল করার পর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে চুম্বন করেছেন (তিরমিযী, হা/৯৮৯)। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃতব্যক্তির চেহারা দেখা এবং তাকে (বিশেষ সম্পর্কের কেউ হলে) চুম্বন করা যায়।

প্রশ্ন (৫০): হতাশা ও দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণের ইসলামী উপায় কী কী?

-ফিরোজ কবীর
নওগাঁ সদর, নওগাঁ।

উত্তর: হতাশা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির উপায়গুলো নিম্নরূপ- ১. আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে কখনো নিরাশ না হওয়া (আয-যুমার, ৩৯/৫৩)। ২. আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ ভরসা ও আস্থা রাখা (আত-তালাক, ৬৫/০৩)। ৩. আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে গাফিল বা উদাসীন না হওয়া (ত্ব-হা, ২০/১২৪)। ৪. উক্ত বিষয়ে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত দু'আগুলো অধিক পরিমাণে পাঠ করা। তন্মধ্যে একটি দু'আ হলো,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ

উচ্চারণ: আল্ল-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযান। অর্থ: 'হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি বর্তমান এবং অতীত সংক্রান্ত যাবতীয় দুশ্চিন্তা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৬৯)।

‘সম্পাদকীয়’-এর বাকী অংশ

পরিশেষে বলতে চাই, যে জাতিসংঘ ফিলিস্তীনে ইসরাঈলের গণহত্যা বন্ধ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ, কাশ্মীরের মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ— তারা বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্য কী করবে? জাতিসংঘের নিজের মধ্যেই তো ন্যূনতম গণতন্ত্র নাই। সেখানে পৃথিবীর সকল দেশের সিদ্ধান্তগ্রহণের নিজস্ব স্বাধীনতা নাই। পৃথিবীর সকল দেশ একত্রিত হয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিলেও তা জাতিসংঘের স্থায়ী কমিটির যেকোনো এক দেশের ভেটোতে বাতিল হয়ে যেতে পারে। সেই পাঁচটি দেশ হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি— আমেরিকা, ইংল্যান্ড, চীন, রাশিয়া ও ফ্রান্স। জাতিসংঘে এই পাঁচ দেশের স্বৈরাচারী ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে, খাদ্যকে মানবাধিকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার এক প্রস্তাবে ২০২১ সালের নভেম্বর ভোটাভুটি হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ একমত হলেও আমেরিকা ও ইসরাঈল বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। আমেরিকার ভেটোর কারণে ন্যূনতম সকল মানুষের জন্য খাদ্যকে মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। তাইতো তারা আজ বীরদর্পে গাযায় ত্রাণ প্রবেশে বাধা দিয়ে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ তৈরি করেছে। যে জাতিসংঘ গাযার মানুষের ন্যূনতম খাবারের অধিকার দিতে পারে না, সেই জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিস বাংলাদেশের মাটিতে জুলাইয়ের রক্তের উপর তৈরি হতে পারে না। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে। বাংলার মুসলিম তাদের নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বদ্ধপরিকর ইনশা-আল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের সুমতি দান করুন! *(প্র. স.)*

মাকতাবাতুস সালাফ

তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হলো সালাফী মানহাজে বিশুদ্ধ ফিকহ চর্চার এক অনন্য সফর!

লেখক: আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান (রহ.)

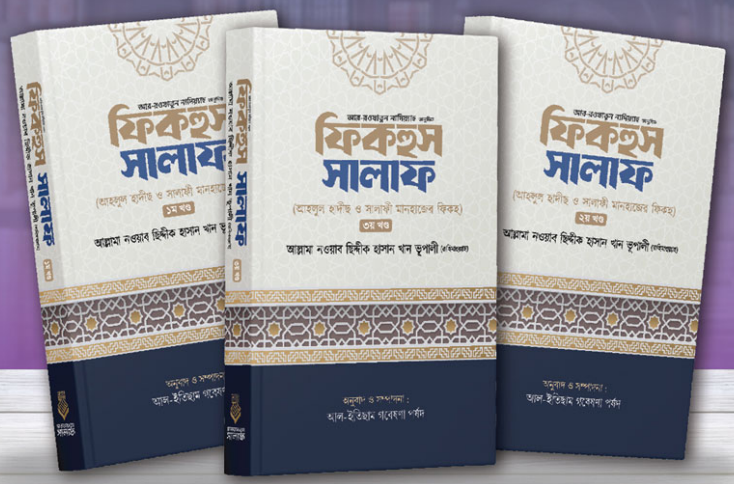

দলীলভিত্তিক আলোচনা,
মাযহাবীয় পক্ষপাতহীন ব্যাখ্যা

সুন্নাহ ও ছাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী মাসায়েল

পুরো সেট ১৭৫০ টাকা মাত্র

★ পত্রিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়!

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

www.al-itisam.com

মাকতাবাতুস সালাফ

অনেক সময় নাম হানাফী হলেও আক্বীদা হয়ে পড়ে মুতাযিলা, জাহমিয়্যাহ বা কালামপন্থিদের মতো!

এই বইতে সেই ভুল ধারণারই নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ—

বইটির বৈশিষ্ট্য

- ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর স্বকীয় আক্বীদার দলীলসমৃদ্ধ উপস্থাপন
- ঈমান, তাক্বদীর, আল্লাহর গুণাবলিসহ গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদাগত বিষয়ে সুন্নাহসম্মত ব্যাখ্যা
- হানাফী আক্বীদার নামে প্রচলিত ভ্রান্ত মত ও বিকৃত ইতিহাসের খণ্ডন
- সালাফে ছালেহীনের মানহাজে লিখিত বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ

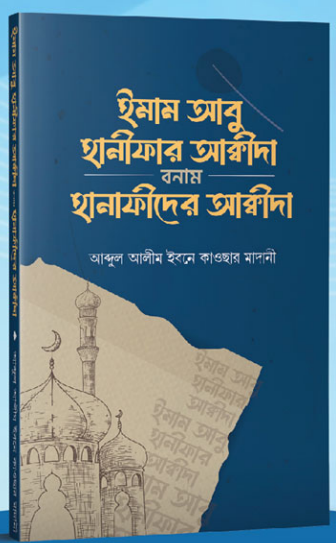

এই বইটি পড়ুন যদি আপনি—

- আক্বীদা বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পেতে চান
- ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর প্রকৃত অবস্থান জানতে চান
- হানাফী মতবাদ ও আক্বীদার বিভ্রান্তি দূর করতে চান

পৃষ্ঠা : ২০০
মূল্য : ১৬০ টাকা

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

তুবা পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত

রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত বনাম প্রচলিত ছালাত

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ৩৯২ মূল্য : ২৪০ টাকা

এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে ভিজট করুন tubapublication.com

রাজশাহী
নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০

www.al-itisam.com